শোষণবিরোধী লড়াইয়ের সনদ

নির্বাচনী ইশতেহার

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন - ২০০৮

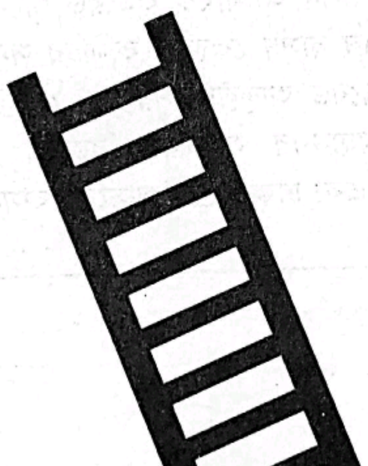

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)

Scanned with CamScanner

১৯ ডিসেম্বর ২০০৮ সকাল ১১টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের কনফারেন্স লাউঞ্জে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) এর 'নির্বাচনী ইশতেহার' শোষণবিরোধী লড়াইয়ের সনদ ৭ দফা ঘোষণা করেন বাসদ আহ্বায়ক কমরেড খালেকুজ্জামান। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী, কমরেড আব্দুল্লাহ সরকার, কেন্দ্রীয় বর্ধিত ফোরামের সদস্য ও ঢাকা মহানগর সমন্বয়ক বজলুর রশীদ ফিরোজ ও রাজেকুজ্জামান রতন এবং ঢাকার ৬টি আসনের বাসদ মনোনীত প্রার্থীরা।

Scanned with
CamScanner

<u>সংবাদ সম্মেলনের বক্তব্য</u>

বিভিন্ন গণমাধ্যম থেকে আগত সাংবাদিক, সংবাদকর্মী এবং সুধীমণ্ডলী,

শুভেচ্ছা জানবেন। ২৯ ডিসেম্বর নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এ নির্বাচনকে সামনে রেখে আমাদের দল বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) এর পক্ষ থেকে দেশের বিরাজমান সংকট, এর কারণ ও প্রতিকারের পথ নির্বাচনী ঘোষণা বা ইশতেহার এর মাধ্যমে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরার জন্য এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

১৯৭১ সালে সশস্ত্র স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামে লক্ষ লক্ষ মানুষের শহীদী আত্মত্যাগ ও বীরোচিত লড়াইয়ের মাধ্যমে আমরা স্বাধীন দেশ পেয়েছি। কিন্তু ৩৭ বছর পরও দেশের জনগণ স্বাধীনতার প্রকৃত স্বাদ পায়নি। কারণ, স্বাধীন বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও গণআকাঙ্ক্ষার বিপরীতে দেশ পরিচালনা করে শাসক বুর্জোয়া শ্রেণী দেশ ও জাতিকে এক ভয়াবহ পরিণতির সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়ার দুইশত বছর পর পুঁজিবাদী ব্যবস্থা চালু রাখতে গিয়ে বাংলাদেশের শাসক বুর্জোয়াশ্রেণী জনজীবনে সংকটের পর সংকট জন্ম দিয়ে চলেছে। স্বাধীনতাত্তোর তারা ৩ বার বড় ধরনের শাসন সংকটে পড়েছে। ১৯৭৫ সালে প্রথম সংকট মোকাবেলায় তৎকালীন রাষ্ট্রপতিকে সপরিবারে খুন করে সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে তারা তা থেকে উত্তরণের চেষ্টা করেছে। ১৯৮১ সালে ২য় সংকটকালেও আরেক রাষ্ট্রপতিকে খুন ও সামরিক শাসন জারি করে তা নিরসনের চেষ্টা হয়েছে। সংকট কমেনি বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে পরিস্থিতিকে আরও জটিল করেছে। জনজীবনে দুর্ভোগ-দুর্দশা বাড়িয়েছে। পুনরায় ২০০৬ সালে এসে ৩য় এবং সবচেয়ে বড় সংকটে পড়ে শাসকশ্রেণী। ১১ জানুয়ারি ২০০৭ জরুরি আইন জারি করে সেনা সমর্থনে ও নিয়ন্ত্রণে তিন মাসের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ দুই বছর বাড়িয়ে বহুল সমালোচিত কথিত সংস্কার কর্মসূচি নিয়ে তারা এ থেকে উত্তরণের পথ খুঁজেছে। পথ পায়নি, সংকট কাটেনি। দায়সারা গোছের পরিস্থিতি সামাল দেয়া হচ্ছে। এটাও আরেকটি মহাসংকটের দিকে দেশকে টেনে নিয়ে যাবে। তা ঘনীভূত হওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র।

দুই বছর আগে বাংলাদেশের শাসক বুর্জোয়াশ্রেণী দ্বি-দলীয় মেরুকরণের জোট-মহাজোটে ভাগ হয়ে ক্ষমতাকেন্দ্রীক হানাহানি, প্রতিহিংসামূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘাত-সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে যে নৈরাজ্যকর অবস্থা সৃষ্টি করেছিল সে সুযোগে সামরিক-বেসামরিক আমলা, ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট, এনজিও ও কথিত সুশীল সমাজের সমন্বয়ে এবং সাম্রাজ্যবাদী বিভিন্ন শক্তির যোগসাজসে গঠিত সিভিল, মিলিটারি, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যুরোক্র্যাটিক কমপ্লেক্স ১১ জানুয়ারি ২০০৭ এ জরুরি আইন জারী করে ক্ষমতা করায়ত্ব করে।

বুর্জোয়াশ্রেণীর সীমাহীন দুর্নীতি-দুঃশাসন-লুটপাট-দলীয়করণের ফলে যে ভয়ংকর শাসনসংকট তৈরি হয় এবং জনমনে যে ঘৃণা ও প্রতিকারস্পৃহা জাগ্রত হয় তাকে সামনে

Scanned with CamScanner

রেখে এ সংকটের হাত থেকে মুক্তির প্রত্যাশা জনগণের ছিল। শাসকশ্রেণী তদারকি সরকার নামে ভিন্ন এক সংস্কার কর্মসূচি নিয়ে হাজির হয়। জনগণ তাদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হারায় এবং মিডিয়াকেন্দ্রীক নিয়ন্ত্রিত রাজনীতি প্রতিষ্ঠা পায়। মিডিয়াও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে শাসকদের ইচ্ছা দ্বারা। তারপর গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ জারি করে রাজনৈতিক দলকে নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এক কথায় রাজনীতিকে রাজপথ ও জনগণের কাছ থেকে সরিয়ে ভিআইপিদের ব্রিফিং কিংবা ড্রইং রুম, টেলিভিশনের পর্দা এবং পার্লামেন্টারি কোন্দল, দল-জোটে নীতিহীন অদল-বদল, কেনা-বেচার বাগাড়ম্বরের অসার জায়গায় নিয়ে যাওয়ার পথ রচিত হয়। তারই অংশ হিসাবে এবং অতীত ধারাবাহিকতায় হতে যাচ্ছে নির্বাচন।

গত দুই বছরে তত্ত্বাবধায়ক সরকার জনগণের আকাঙ্ক্ষার সাথে সুর মিলিয়ে কথা বলেছে আর জনস্বার্থের প্রত্যাশার বিপরীতে কাজ করেছে। ৩৭ বছরের ধনিকশ্রেণীর শাসন যে পরিমাণ দুর্নীতি, দুর্বৃত্তায়ন, স্বেচ্ছাচার, স্বৈরাচার চালিয়ে কলংকিত ও জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখাত হয়েছিল। ১১ জানুয়ারি ২০০৭ জরুরি আইন জারি করে সেই অধঃপতিত দুর্নীতিগ্রস্ত লুটপাটের বুর্জোয়া রাজনৈতিক দল ও নেতৃত্বকেই পুনর্বাসিত করার প্রক্রিয়া চলছে। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সে কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। দুর্নীতি-দুঃশাসন-লুটপাট রেকর্ড পরিমানে উন্মোচিত হওয়া এবং জনগণের দুর্নীতিবিরোধী আকাঙ্ক্ষা থাকার পরেও দুর্নীতিবাজদের বিচার ও দুর্নীতি দমনে তেমন কিছুই করতে পারেনি সরকার। বরং দুই বছর জরুরি অবস্থার দড়িতে জনগণের হাত-পা বেঁধে রেখে কণ্ঠস্বর চাপা দিয়ে নির্বাচনের মাত্র ১২ দিন আগে জরুরি অবস্থা তুলে নিয়েছে। ফলে নতুন চেতনার বিকাশ ও জনগণের নিজস্ব শক্তির উত্থান ঘটতে পারেনি। মানুষ নতুন বোতলে পুরোনো মদ দেখতে চায় না আবার বিকল্প শক্তি নির্মাণে ভূমিকা পালন করতে না পেরে এখন অসহায় হয়ে প্রত্যাখ্যাত শক্তির হাতেই পুনরায় জিম্মি হতে চলেছে।

এ অবস্থা থেকে মুক্তির পথ রচনা সম্ভব ছিল সকল বাম-প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের ঐক্যবদ্ধ বিকল্প তৈরির মাধ্যমে। আমরা আমাদের দলের পক্ষ থেকে বুর্জোয়া দ্বি-দলীয় মেরুকরণের বাইরে জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী বাম বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তুলতে চেয়েছি। সৎ ও নীতিনিষ্ঠ অবস্থান থেকে কাজ করেছি। বাসদ, কমিউনিস্ট পার্টি, ওয়ার্কার্স পার্টিসহ অপরাপর সকল বামপন্থী দল একযোগে দাঁড়ালে অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে অনেক দূর অগ্রসর হওয়া যেত। কিন্তু কিছু বামপন্থী দলের বুর্জোয়া দল নির্ভরতা ও ভ্রান্তির কারণে বাম বিকল্প গড়ার কাজটি সম্পন্ন করা যায়নি। জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী বাম বিকল্প গড়ে ওঠার সম্ভাবনাও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। তারপরও জরুরি আইন জারির পর আমরা দলীয়ভাবে এবং অন্যান্য ১০ টি বামপন্থি দলের সমন্বয়ে গঠিত গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধভাবে সাধ্য অনুযায়ী গণআন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করেছি। ১১ জানুয়ারি জরুরি আইন জারির পরই ১৩ জানুয়ারিতে ঢাকার মুক্তাঙ্গনে প্রতিবাদ করেছি। এর পর ধারাবাহিকভাবে ছাত্র-শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত দাবির পক্ষে অবস্থান নিয়ে আন্দোলন করার চেষ্টা করেছি। বঙ্গপোসাগরে তেল-গ্যাস

Scanned with CamScanner

অনুসন্ধানের জন্য বিদেশী বহুজাতিক কোম্পানীকে ইজারা দেয়ার প্রতিবাদে আন্দোলন করেছি। এ সবের মাধ্যমে সচেতন জনগণের কাছে এবং বাম মহলে আদর্শিক ও নৈতিক অবস্থান তুলে ধরতে আমরা সক্ষম হয়েছি।

সাংবাদিক বন্ধুগণ,

জনগণের অসহায়ত্ব ও বুর্জোয়া দলসমূহের দেউলিয়াত্ব, সামগ্রিক পরিস্থিতির নেতিবাচক প্রভাবে আন্দোলনহীন পরিবেশে দেশী-বিদেশী লুটেরা গোষ্ঠী নতুনভাবে তৎপর হয়ে উঠেছে। বহুজাতিক কোম্পানির মুনাফার স্বার্থ সংরক্ষণে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহের দূতেরা নানামুখী তৎপরতায় লিপ্ত, শাসকদের বিভিন্ন অংশের কাছ থেকে কত বেশী স্বার্থ-সুবিধা আদায় করতে পারে তার জন্য। উগ্র মৌলবাদী-জঙ্গী-সাম্প্রদায়িক শক্তি পুনরায় মাথা চাড়া দিয়ে ওঠেছে। রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার মাত্রা ছাড়িয়েছে। একদিকে সাম্প্রদায়িকতানির্ভর পতিত স্বৈরাচার অন্যদিকে স্বাধীনতাবিরোধী ও যুদ্ধাপরাধী চক্র দুই জোটের কাঁধে চেপে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ইসলামের নামে গণতন্ত্রবিরোধী কুখ্যাত বস্নাসফেমী আইনের আওয়াজ তুলেছে। এই প্রতারণা গণতন্ত্রে উত্তরণের বদলে গণতান্ত্রিক চেতনা ও মূল্যবোধকে আরও ক্ষতিগ্রস্ত করবে। সরল ধর্মবিশ্বাসী মানুষকে প্রতারণার মাধ্যমে রাজনীতির গুটি হিসাবে ব্যবহার করার এই চক্রান্ত মোকাবেলার জন্য দেশবাসীকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

দেশের এই ভবিষ্যৎ সংকট থেকে দেশ ও জনগণকে বাঁচানোর জন্য গণআন্দোলন ও গণসংগ্রাম গড়ে তোলার বিকল্প নেই। আমরা পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার সৃষ্ট এই সর্বগ্রাসী সংকট থেকে মুক্তির লক্ষ্যে গণআন্দোলনকে এগিয়ে নেয়ার জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছি। জনগণের নিজস্ব রাজনৈতিক শক্তি নির্মাণ ও বিকশিত করার অংশ হিসেবেই একটি বিপ্লবী বামপন্থী দল নির্বাচনে অংশ নেয় আমরাও সে বিবেচনাতেই নির্বাচনে অংশ নিচ্ছি।

আমাদের দলের পক্ষ থেকে সারা দেশে ৫৭ জন প্রার্থীকে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। এদের প্রত্যেকেই সৎ, ত্যাগী এবং জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে পরীক্ষিত সৈনিক, সংগ্রামী মানুষ। জনগণের বিবেকের কাছে আমাদের প্রত্যাশা বড় দল নয়, ভাল দল ও বড় আদর্শের পক্ষে আপনাদের রায় দিন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অভিশপ্ত পুঁজিবাদী শোষণের হাত থেকে রক্ষা করে মানুষ হিসাবে বাঁচার পথ করে দিন।

সংগ্রামী বন্ধুগণ,

নির্বাচন এলেই নানা ওয়াদা, প্রতিশ্রুতি ও জনগণের আশা পুরণের নানা আশ্বাসবাণীতে কাগজ ভরে যায়। অতীত অভিজ্ঞতা বলে এগুলো বাস্তবসম্মত, গভীর অনুসন্ধান ও গবেষণালব্ধ, বাস্তবায়নযোগ্য কিংবা বিবেচনাপ্রসূত হয় না, নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়া পালের বাতাসের মতো কাজে লাগে মাত্র। আমরা মনে করি কোন কর্মসূচি তা যত মহৎ এবং সুন্দরই হোক্ না কেন, ব্যাপক জনগণের সচেতন অংশগ্রহণ ও উদ্যোগী ভূমিকা ছাড়া একক দল বা জোটের পক্ষে তা বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। প্রথমে দরকার গণসচেতনতা এবং গণআন্দোলনের মাধ্যমে সৃষ্ট গণঐক্য ও গণউদ্যোগ। সেই লক্ষ্যে

Scanned with CamScanner

আমরা কিছু দেবার ওয়াদার বদলে জনগণের অধিকার, ন্যায্য প্রাপ্য এবং তা বাস্তবায়নের উপযোগী শাসন ও সমাজব্যবস্থা তথা শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা তৈরি করতে চাই। সেই লক্ষ্যে নির্বাচনে মতামত গঠন, পার্লামেন্টের ভিতরে-বাইরে জনগণের নিজস্ব কণ্ঠস্বর তোলা এবং নির্বাচনোত্তর সংগ্রামের জমি তৈরি করার পদক্ষেপ হিসাবে আমাদের দলের পক্ষ থেকে শোষণবিরোধী লড়াইয়ের সনদ ৭ দফা হাজির করছি।

শোষণবিরোধী লড়াইয়ের সনদ-৭ দফা কর্মসূচি

রাজনীতি সমাজের পরিচালিকা শক্তি। অথচ গত ৩৭ বছরেরর দুর্নীতিগ্রস্ত, দুর্বৃত্তায়িত, অধঃপতিত, লুটপাটের বুর্জোয়া রাজনীতি, নানা মতে-পথে বিভ্রান্ত হঠকারী ও লেজুড়বৃত্তির বাম রাজনীতি, উগ্র ধর্মান্ধ মৌলবাদী-সাম্প্রদায়িক সহিংস রাজনীতির আবর্তে মানুষ দিশেহারা। এই পরিস্থিতিতে বাসদ অপরাপর বাম-গণতান্ত্রিক-প্রগতিশীল ক্তিসমূহকে সাথে নিয়ে সমাজ, রাষ্ট্র ও রাজনীতির একটা আমূল পরিবর্তন সাধনের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ গণসংগ্রামকে এগিয়ে নিতে চায়। সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ-মৌলবাদবিরোধী সংগ্রামকে বেগবান করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও গণ-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন চায়।

আমরা সর্বস্তরের জনগণের নৈতিক সমর্থন, আর্থিক সহযোগিতা, সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রত্যাশা করি। দেশবাসীর সর্বাত্মক সমর্থন, সহযোগিতা গণদাবি প্রতিষ্ঠার গণআন্দোলন-গণসংগ্রামকে বেগবান করবে, জয়যুক্ত করবে। ভবিষ্যৎ গণসংগ্রামে শরিক হওয়ার জন্যও আমরা দেশবাসীর কাছে আহ্বান জানাই।

প্রিয় দেশবাসী,

'সব হাতে কাজ সব মুখে ভাত'-এর অধিকারসহ আরও বহুবিধ মৌলিক-গণতান্ত্রিক-মানবিক-ন্যায্য অধিকার থেকে জনগণ আজও বঞ্চিত। একটি সত্যিকার স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক দেশে এ সব দাবি তোলার কথা ছিল না। কারণ একটা স্বাধীন-সার্বভৌম দেশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনগণের মৌলিক-গণতান্ত্রিক অধিকারের নিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে এ সব দাবি পূরণ হয়ে যাওয়ার কথা। বৃটিশের ২০০ বছরের ঔপনিবেশিক শাসন এবং পাকিস্তানিদের ২৩ বছরের প্রায়-ঔপনিবেশিক শাসনে বাংলাদেশের জনগণের জীবনে এ অধিকারসমূহ প্রতিষ্ঠা পাবে একথা কেউ আশা করে নি। কারণ তারা বিদেশ থেকে লুট করতে এসেছিল। কিন্তু ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জনের ৩৭ বছর পরও কেন আমাদের এ সব দাবি বাস্তবায়িত হলো না। এ থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায় যে আমাদের এ ভূখণ্ড স্বাধীন হলেও মানুষ স্বাধীন হয়নি। বৃটিশ-পাকিস্তানি লুটেরাদের জায়গায় বাঙালি লুটেরা এবং তাদের যোগসাজশে সাম্রাজ্যবাদী বিভিন্ন লুটেরাগোষ্ঠী আমাদের কাঁধে চেপে বসেছে। অর্থাৎ বিদেশি লুটেরা শাসনের পরিবর্তে স্বদেশি লুটেরাদের শাসন কায়েম হয়েছে। সে জন্যই আমাদের দুর্দশার অন্ত নেই। একটা সম্পদশালী দেশ হওয়া সত্ত্বেও আমরা দরিদ্র হয়ে

Scanned with CamScanner

আছি, দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করছি। আমাদের ভিখিরির সাজ পরিয়ে রাখা হয়েছে। এ অবস্থার পরিবর্তনই আমাদের লক্ষ্য।

- স্বাধীন দেশে গণতান্ত্রিক শাসন বলতে বোঝায় ঐ ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তিমাত্রেরই ৬টি মৌলিক অধিকার বা জন্মগত অধিকার ভোগ করার নিশ্চয়তা থাকবে। এগুলো হল ভাত, কাপড়, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান ও কাজ। পাশাপাশি সাধারণ গণতান্ত্রিক অধিকার বলতে আমরা বুঝি মতামত গঠন ও মতপ্রকাশ, স্বাধীন চিন্তার অবাধ চর্চা, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, যৌক্তিক গ্রহণ-বর্জন, সৃজনশীলতা, মানুষের জান-মাল-ইজ্জত রক্ষা, বিবেক ও মূল্যবোধের জাগরণ, জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গণসচেতনতা সৃষ্টি ও তাদেরকে সংগঠিত করা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, সংগঠন-আন্দোলন, প্রতিনিধি নির্বাচন, জনগণের প্রকৃত ক্ষমতায়ন ইত্যাদির রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা। আর এগুলোকে বাধাগ্রস্ত করে এমন কোন আইন, প্রথা-প্রতিষ্ঠান ও শক্তির বিলোপ সাধন করা গণতান্ত্রিক শাসনের শর্ত। তা না হলে, শুধু ভোট করলেই গণতন্ত্র হয় না। কিন্তু আমাদের শাসকগোষ্ঠী গণতন্ত্রের কথা বলে বলেই মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকারবিরোধী ঘোষিত-অঘোষিত বিধান, প্রথা-প্রতিষ্ঠান, পরিবেশসহ আইন-কানুন জারি রেখেছে শুধু নয়, ক্রমাগত একটার পর একটা সংযোজন করে চলেছে।

- ১৯৮০ সালে আমরা দলের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বলে আসছি যে বাংলাদেশে যে অভাব-দারিদ্র্য দৃশ্যমান এবং বিরাজমান তা এদেশের প্রকৃত বাস্তবতা নয়। পুঁজিবাদী শোষণ-লুটপাট, চুরি-দুর্নীতি, সম্পদ পাচার, পরনির্ভরশীলতা, অব্যবস্থাপনা, সঠিক পরিকল্পনার অভাব, অদূরদর্শিতা ও জনশক্তির সীমাহীন অবহেলার মধ্য দিয়ে এ অবস্থা তৈরি করা হয়েছে। উর্বর জমি, মিঠা পানির বিপুল প্রবাহ, গ্যাসসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ আর জনশক্তি; শুধু এই চারটির সঠিক ব্যবহার করতে পারলে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক দিক থেকে একটি উন্নত ও অগ্রসর দেশ থাকত। আর এখন দেশে প্রায় সোয়া ৪ কোটি বেকার। ২ কোটি মানুষ ছিন্নমূল, ঢাকা শহরেই ৩০ লক্ষাধিক মানুষ বস্তিতে বাস করে। শিক্ষাবঞ্চিত মানুষ ৮ কোটির অধিক, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত মানুষ ৯ কোটি। ভূমিহীনের সংখ্যা স্বাধীনতার পর ২৩ শতাংশ থেকে বেড়ে ৭০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ২০ কোটি মানুষের খাবার যে দেশের মাটি দিতে সক্ষম সেই দেশে ৮ কোটি মানুষকে এক বেলা খেয়ে থাকতে হয়। খাদ্য উৎপাদন গত দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেড়েছে। তারপরও মানুষ না খেয়ে থাকে, আমদানি বাড়তে থাকে। এভাবেই কৃত্রিম সংকটের সুযোগ নিয়ে মজুতদারি আর বিদেশ থেকে আমদানির মারপ্যাঁচে মুষ্টিমেয় লোক ফুলে-ফেঁপে উঠে।

- পাকিস্তানি ২২ পরিবার হটিয়ে আমরা কয়েক হাজার কোটি টাকার মালিক বাংলাদেশী লুটেরা ৩৬টি পরিবার বানিয়েছি। আমাদের দেশের অভ্যন্তরীণ লুটপাটের চিত্র ভয়াবহ, প্রতি বছর অবৈধভাবে অর্জিত ৫০ হাজার কোটি কালো

Scanned with CamScanner

টাকা ১০ লক্ষ লোক হাতিয়ে নেয়। এর সিংহভাগ উপরতলার ১ লক্ষ লোকের পকেটে যায়, যার মধ্যে রয়েছে মন্ত্রী, এমপি, বিভিন্ন বুর্জোয়া-পাতি বুর্জোয়া দলের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ, কথিত ব্যবসায়ী-শিল্পপতি, সামরিক-বেসামরিক সর্বোচ্চ পদের ও পর্যায়ের আমলারা। আর ১৩ কোটি ৯০ লক্ষ মানুষ এর ভোগান্তির শিকার। খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৩০ হাজার কোটি টাকা, যা বাস্তবে ৫০ হাজার কোটিতে পৌছার কথা, তাকে কথিত রিশিডিউলিং এবং সুদ ও আসল মওকুফ করে বারে বারে কম দেখানো হয়। আবার তা বেড়ে চলে। এইভাবে চলছে ব্যাংক ডাকাতি। এই প্রক্রিয়ায় একদল লোক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের টাকা আত্মসাৎ করে ব্যাক্তিমালিকানাধীন ব্যাংক গড়ে তুলেছেন। শুধু আমদানির হিসাব হের-ফের করে প্রতিবছর দেশ থেকে পাচার হয় সাড়ে ৬ হাজার কোটি টাকা।

- প্রতিদিন পত্র-পত্রিকায় লুটপাটের অসংখ্য খবর প্রকাশিত হয় এবং শাসকশ্রেণীর পক্ষ থেকে এসবের প্রতিবাদও শোনা যায় না। যেমন (১৯৭২-'৯৯) ব্যাংক-বীমা, উপজেলা, শিল্প-কারখানা বিরাষ্ট্রীয়করণ এই তিন খাতে ১৯৭২-'৯৯ পর্যন্ত দুর্নীতি হয়েছে ৫৪ হাজার কোটি টাকা, যার পরিমাণ আমাদের ১০ বছরের উন্নয়ন বাজেটের চেয়েও বেশি। দেশের মোট রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের মাত্র ৫% অডিট করে ১,০০০ কোটি টাকার অনিয়মের সন্ধান পাওয়া গেছে। অডিটের ৭৩টি রিপোর্টে ১৯৮৩টি আর্থিক অনিয়মের সন্ধান পাওয়া গেছে। ৯টি মন্ত্রণালয় ২৩ বছরে ২৫০৭ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা অপচয় ও আত্মসাৎ করেছে, সরকারি পাওনা উদ্ধার করতে পারে নি ১১,০৯৫ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা। সরকারের ২৪টি মন্ত্রণালয় ও সংস্থা উচ্চমূল্যে যন্ত্রপাতি ক্রয়, মালামাল ঘাটতি, অর্থ আত্মসাৎ, ভ্যাট-কর ফাঁকি ইত্যাদি পথে ১৫ হাজার কোটি টাকা লোপাট করেছে। অডিটে প্রতিরক্ষা খাতে প্রায় ১৯৮ কোটি টাকার অনিয়ম ধরা পড়েছিল। মিগ-২৯ বিমান ও ফ্রিগেট কেনায় দুর্নীতি ও অপচয় হয়েছে প্রায় ১৫০০ কোটি টাকা। পুলিশের বেতন এমন পর্যায়ে রাখা হয়েছে এবং বিরোধী পক্ষকে দমন করার পুরস্কার হিসাবে এমন সুযোগ খোলা রাখা হয়েছে যাতে তারা ঘুষ খেতে বাধ্য হয় এবং নিরাপদ থাকে। সেজন্য এরা বছরে প্রায় ২০৬৬ কোটি টাকা ঘুষ খায়। নিম্ন আদালতে ঘুষ লেন-দেন হয় প্রায় ১১৩৫ কোটি টাকা। কেরাণীগঞ্জে ৩৫টি মাদকপট্টি, ১৬টি তেল চুরির ঘাঁটি, ১১৮টি নকল সামগ্রী তৈরির কারখানা থেকে পুলিশের আয় মাসিক ২০ লক্ষ টাকা। ২০০১-২০০৬ সালের জোট সরকারের অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন, ১ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণে খরচ হয় ২ কোটি টাকা, আর ব্যয় দেখানো হয় ১০ কোটি টাকা। অর্থাৎ ১ কি.মি রাস্তা নির্মাণে ৮ কোটি টাকা চুরি হয়। ২৮ মার্চ '০৫ দৈনিক প্রথম আলোতে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত ৭ বছরে ৪১টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের অধীনে উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য কেনা প্রায় সাড়ে ২৬ হাজার গাড়ির মধ্যে ৩ হাজার দামি গাড়িসহ ২৬ হাজারেরই কোন হদিস পাওয়া যাচ্ছে না, ইত্যাদি। এর বাইরেও দুর্নীতির হাত এতটা বিস্তৃত যে গত ১৯৯৬-২০০১ সালে আওয়ামী ঐক্যমত্যের সরকারের আমলে ১ বার এবং ২০০১-২০০৬ জোট সরকারের

Scanned with CamScanner

আমলে ৫ বার বিশ্বের সেরা দুর্নীতিবাজের কালিমা আমাদের গায়ে লেপন করা হয়েছে। এ লুটতরাজই শাসনক্ষমতার দ্বি-দলীয় কোন্দল-সন্ত্রাস, মৌলবাদী সহিংসতা-সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। তাছাড়া তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে দুর্নীতির যে চিত্র প্রকাশিত হয়েছে ত্রাণের টিন থেকে শুরু করে কি নেই সেখানে? সেনা প্রধান ২০০৭ সালের ২৬ মার্চ বলেছিলেন শুধু বিদ্যুৎ খাতেই দুর্নীতি হয়েছে ২০ হাজার কোটি টাকা।

- আমাদের দেশে যে ঋণ-খয়রাত আনা হয় সে সম্পর্কে বলা হয়েছে, বিগত দিনে ২ লক্ষ কোটি টাকা তথাকথিত দাতা দেশসমূহের কাছ থেকে ঋণ করা হয়েছে। এর ৪৫ হাজার কোটি টাকা ওরাই কনসালটেন্সি, মালবিক্রিসহ নানা কায়দায় নিয়ে গেছে। দেশের লুটেরাদের পকেটে গিয়েছে ৫৪ হাজার কোটি টাকা, গ্রাম-শহরে টাউট শ্রেণী লুট করেছে ৩৬ হাজার কোটি টাকা। বাদবাকি ৪৫ হাজার কোটি টাকা সত্যিকার উন্নয়ন বা জনগণের ভাগে পড়েছে, যদিও হতদরিদ্রদের প্রত্যক্ষ পাওয়ার হিসাব ধরলে কিছুই মিলবে না। বাংলাদেশ গড়ে বছরে ৭০০ মিলিয়ন ডলার বিদেশি ঋণ-সাহায্য পায়, এর সুদ হিসেবে ফেরত দেয় ৬৫০ মিলিয়ন ডলার। দু'এক বছর পরে প্রাপ্ত অর্থের চেয়ে অধিক অর্থ এদেশ থেকে কথিত দাতা দেশগুলোতে ফেরত যাবে। আর এই ঋণ-খয়রাতের সমান্তরালে কারখানা বন্ধ, শ্রমিক ছাঁটাই, নানা নামে জাতীয় স্বার্থবিরোধী কত প্রকার শর্ত যে থাকে তার অন্ত নেই।

  বিশ্বব্যাংক ২০০২ সালে যে টাকা দিয়েছিল তার সাথে শর্ত দিয়েছিল যে পরবর্তী ৫ বছরের মধ্যে বাংলাদেশে ১ লক্ষ ১৫ হাজার শ্রমিক ছাঁটাই করতে হবে এবং বিদ্যুৎ-ব্যাংক-বীমাসহ সেবাখাত ব্যক্তিখাতে ছেড়ে দিতে হবে। সরকার সেগুলো একে একে বাস্তবায়ন করে জাতীয় অর্থনীতিকে পঙ্গু এবং বিদেশনির্ভর করে চলেছে। বিশ্বব্যাংক দুর্নীতিপরায়ন ও শর্তযুক্ত ঋণ দিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং পরিবেশের যে ক্ষতি করেছে তার থেকে বাঁচার জন্যই এখন দায়মুক্তি চাইছে, অর্থাৎ এদের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে মামলা করা যাবে না। দেশপ্রেমিক শক্তিসমূহের বিরোধিতা সত্ত্বেও বিগত সরকারগুলো তা বাস্তবায়নের চক্রান্ত করছে।

- এ কথা মনে রাখা দরকার যে একটা দেশের সমৃদ্ধ কৃষির উপর ভিত্তি করেই শিল্পায়ন ও শিল্প বিপ্লব ঘটে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ নিজের দেশের এ ঘাটতি পূরণ করার জন্যই কৃষিসমৃদ্ধ ভারত দখল করেছিল। বৃটিশ, ফরাসী, মার্কিনীরা এইভাবে কৃষি ও খনিজসমৃদ্ধ এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা দখল ও লুট করেছিল; আজও করে চলেছে। অথচ আমরা স্বাধীনতার পরও আমাদের সমৃদ্ধ ও সম্ভাবনাময় কৃষিকে উন্নত করা এবং কৃষিভিত্তিক শিল্প নির্মাণের বদলে কৃষিভিত্তিক আদমজীসহ পাটকল, সূতা-বস্ত্রকল, চিনিকল ইত্যাদি চুরি-দুর্নীতি করে লোকসানি খাত বানিয়ে দেশি-বিদেশি লুটেরাদের হাতে তুলে দিয়েছি কিংবা বন্ধ করে দিয়েছি। কৃষি এবং কৃষককূলকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এনে দাঁড় করিয়েছি। আর

Scanned with CamScanner

রফতানিমুখী শিল্প-বাণিজ্যের নামে সস্তা শ্রমশোষণ ও লুটতরাজের রাস্তা খুলে দিয়েছি।

- স্বাধীনতার পর কৃষিজমির সিলিং ঘোষণা করা হলেও নামে-বেনামে দখলকৃত জমি উদ্ধার কিংবা আমূল ভূমিসংস্কারের কোন উদ্যোগ নেয়া হয় নি। ভূমিব্যবস্থা এখনো সম্পূর্ণ অপরিকল্পিত, দুর্নীতি ও অব্যবস্থার ক্ষেত্র হয়ে রয়েছে। যার জন্য প্রতিবছর শুধু ভূমিসংক্রান্ত মামলায় জনগণকে ২৫ হাজার কোটি টাকা খরচ করতে হয়, যার অর্ধেকেরও বেশি যায় ঘুষ হিসেবে। এই অর্থের পরিমাণ বাংলাদেশের বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটের চেয়েও বেশি। ৬.২ ভাগ পরিবার দেশের ৪০ ভাগ জমির মালিক হয়ে বসে আছে। দেশের খাস জমির পরিমাণ প্রায় ১ কোটি বিঘা। এর মধ্যে ব্যক্তিদের অবৈধ দখলে আছে ৪২ লাখ বিঘা, যার দাম প্রায় ৯০ হাজার কোটি টাকা। এ জমি ভূমিহীনদের মধ্যে সমবায় ভিত্তিতে বণ্টন করা গেলে বেকার সমস্যার কিছুটা লাঘব ও উন্নয়ন ঘটত। শুধু ঢাকা শহরের আশেপাশের এলাকায়ই ৩০ হাজার বিঘা জমি ১০টি হাউজিং কোম্পানির দখলে আছে বলে জানা যায়। রাজউক স্বীকার করেছে, ঢাকায় খাস জমি দখল করে ৭০/৮০টি বহুতল ভবন অবৈধভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। এগুলোর কোন প্রতিকার নেই। বস্তি এলাকার খাস জমিতে সরকারি উদ্যোগে কমদামি বহুতল ভবনের পাশাপাশি পাঁচ ইঞ্চি দেয়াল দিয়ে গ্যাস-বিদ্যুৎ-পানি সুবিধাসহ সহজলভ্য ঘর নির্মাণ করে দীর্ঘমেয়াদী কিস্তিতে ৩০ লাখ বস্তিবাসীর মধ্যে হস্তান্তর করলে অথবা ভাড়া দিলে রাজস্ব আয় বাড়ত এবং স্বল্প আয়ের মানুষদের জীবনমানেরও উন্নতি ঘটত। এখন সন্ত্রাসী ও পুলিশ বখরা তুলে খায়। আর ক্ষমতাধররা সময়-সুযোগ বুঝে আগুন লাগিয়ে বস্তি উচ্ছেদ করে জায়গা দখলে নিয়ে বহুতল ভবন নির্মাণ করে। সর্বস্ব হারিয়ে গ্রাম থেকে উঠে আসা মানুষদের গ্রামে যেমন জমি কিংবা কাজের কোন সংস্থান হয় নি, তেমনি কাজের আশায় ছুটে আসা মানুষদের কাজ দেয়ার দায়িত্বও রাষ্ট্র নেয় নি। তারপরও তারা স্বকর্মের ব্যবস্থা করে রিক্শা-ঠেলা-ভ্যান চালানো, গৃহস্থালী, হকারি ইত্যাদি করে বছরে প্রায় ১২০০ কোটি টাকা গ্রামে পাঠায়। এদের পুনর্বাসন ছাড়া উচ্ছেদ অমানবিক, বেআইনী, বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ অর্থনীতিতে হাহাকার সৃষ্টিতুল্য।

- বাংলাদেশ টিকে আছে কৃষির উপর। তারপরও কৃষি ও কৃষকের উন্নতির সাথে যে দেশের উন্নতি সম্পর্কিত, কথার ফুলঝুরির বাইরে এ নিয়ে শাসকদের বিন্দুমাত্র ভাবনা নেই। কৃষিখাতে উন্নয়ন বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং তার সঠিক ব্যবহারের কোন উদ্যোগ নেই। কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)-কে পঙ্গু করে রাখা হয়েছে। আখ-পাট প্রভৃতি শিল্পসম্পৃক্ত ফসলের চাষ নিরুৎসাহিত করে বন্ধ্যা-টার্মিনেটর বীজ আমদানিসহ কৃষি ধ্বংসের নানাবিধ প্রক্রিয়া চালু করা হচ্ছে। চাষের মওসুমে সার-বীজ-কীটনাশক-ডিজেল সংগ্রহ করতে গিয়ে কৃষকরা সীমাহীন হয়রানির শিকার হয়। বিশেষত সার-বাবদ কৃষকের পকেট থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেয় ব্যবসায়ী-মজুতদাররা। বস্তা প্রতি ২০ টাকা থেকে ৭০০ টাকা বেশি দাম

Scanned with CamScanner

দিয়েও কৃষকদের সার কিনতে হয়েছে। একইভাবে কৃষিঋণ নিয়ে সরকারি ব্যাংক, এনজিও বা স্থানীয় মহজনদের কাছ থেকে ঘুষ আর চড়া সুদের বিনিময়ে, অগ্রীম ফসল বন্ধক রেখে তবে নামমাত্র ঋণ পাওয়া যায়। আর এই কৃষকরাই যখন ফসল বিক্রি করতে বাজারে নিয়ে যায়, তখন তার দাম পায় না। ঢাকার বাজারে যখন টমেটো/বেগুন ২০ টাকা কেজি, তখন প্রত্যন্ত অঞ্চলের কৃষক সেই টমেটো/বেগুন ২ টাকায় বিক্রি করতে বাধ্য হয়। সরকার গঞ্জে ও হাটে ন্যায্যমূল্যে খোদ কৃষকদের কাছ থেকে কৃষিপণ্য কিনে সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ করলে ও কৃষিভিত্তিক নানা ধরনের শিল্প-কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ নিলে কৃষক, কৃষি, শিল্প এবং কর্মসংস্থানের একটা বিহিত হতে পারত।

- শহরের বাড়ি ভাড়া, গাড়ি ভাড়ারও কোন নিয়মনীতি নেই। এলাকাভেদে প্রাপ্ত সুবিধাদির ভিত্তিতে প্রতি বর্গফুট বাড়ির ভাড়া সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন কত হবে, তার কোন নিয়ম-নীতি কার্যকর নেই। এ ক্ষেত্রে বিরাজমান নৈরাজ্যের কারণে ফি বছর বাড়ি ভাড়া বাড়ছে। গত ১৬ বছরে বেড়েছে ২৪১.৭৩%। বাস, মিনিবাসে বসার আসন কিংবা মাইলপ্রতি ভাড়ার হারেরও কোন নিয়ম নেই। আইনত যে বাসে ৪০ জন বসার ব্যবস্থা থাকার কথা সেখানে দেখা যাবে ৫০/৬০ জনের আসন বসানো হয়েছে। এর বাইরেও অনেকে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। অথচ ভাড়া একই এবং খেয়াল-খুশি মাফিক বাড়ছে। এখন সস্তা সিএনজি গ্যাসে বাস চললেও ভাড়া কমছে না। বরং যখন-তখন যেমন খুশি গেটলক, সিটিং সার্ভিস ইত্যাদি নাম দিয়ে ভাড়া বাড়ানো হচ্ছে। যাত্রীদের সঙ্গে এ নিয়ে বচসা নিত্যদিনের। এগুলো দেখার কেউ নেই।

- মুক্তবাজারের নামে আমেরিকার নেতৃত্বে বিশ্বসাম্রাজ্যবাদ সারা দুনিয়ার বাজার লুট করার যেসব আয়োজন করেছে, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই বাংলাদেশ তাতে যোগ দিয়ে লুটতরাজে বিধক্ষস্ত শিল্প-কৃষিকে চূড়ান্ত ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। মুক্তবাজার বাস্তবে কোথাও নেই। আমেরিকার বাজারও সবদিক থেকে মুক্ত নয়; ইউরোপের ইস্পাত, জাপানি গাড়িসহ হরেক রকম পণ্যের অবাধ আমদানির উপর বাড়তি কর ও নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। ভারতের বাজারও পুরো খোলা নয়। অথচ বাংলাদেশের শাসকশ্রেণী পুরো বাজার খুলে দিয়ে আত্মঘাতি পদক্ষেপ নিয়েছে। আর যখন কারখানার পর কারখানা বন্ধ হয়ে মার্কেটের পর মার্কেট গড়ে উঠছে, বিশ্বের বৃহত্তম পাটকল বন্ধ হয়ে দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম শপিং মল (দোকান) গড়ে উঠছে, তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না অর্থনীতি কোন দিকে ধাবিত হচ্ছে! যখন আমাদের আদমজী বন্ধ হয়, তখন ভারতে ৬টি নতুন পাটকল তৈরি হয়। দেশের একমাত্র ইস্পাত কারখানা চট্টগ্রাম স্টীলমিল বন্ধ করে ভারতের টাটা কোম্পানিকে ডেকে আনা হয়েছিল স্টীলমিল করার জন্য। আমদানি-রফতানি, ব্যবসা-বাণিজ্যে বছর বছর বাণিজ্য ঘাটতি বেড়েই চলেছে। শুধু ভারতের সাথেই বাণিজ্য ঘাটতি বছরে ৯ হাজার কোটি টাকার বেশি। চোরাপথে বাণিজ্যে ঘাটতির তো কোন হিসাবই নেই।

Scanned with CamScanner

- আমাদের গ্যাস সম্পদ যা দিয়ে আমরা অর্থনৈতিক উন্নতির অনেক ধাপ উঠে যেতে পারতাম তাকেও লুটেরাদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন কর্পোরেশন (বাপেক্স) এবং পেট্রো বাংলা ১০টি গ্যাসক্ষেত্র সফলতার সঙ্গে খনন করেছে। গভীর সমুদ্র ও গহীন বন ছাড়া বাকিগুলো তোলার ক্ষমতা আমাদের ছিল। কিন্তু ১৯৯২ সাল থেকে দেশের গ্যাস সম্পদকে ২৩টি ব্লকে ভাগ করে প্রথমে বিএনপি সরকার ৫টি ও পরে আওয়ামী লীগ সরকার ৭টি ব্লক মার্কিন-বৃটিশ কোম্পানীর হাতে তুলে দিয়েছে। উৎপাদন বণ্টন চুক্তি (Production sharing contract - PSC) অনুযায়ী গড়ে এই গ্যাসের ৭৯ ভাগ ওদের আর ২১ ভাগ আমাদের। এখন যতটুকু গ্যাস উত্তোলনযোগ্য সেই ১ লক্ষ ৯০ হাজার কোটি টাকার গ্যাস দিয়ে বিদ্যুৎ-সার-সিএনজি, শিল্প, গার্হস্থ্য ব্যবহারসহ মূল্য সংযোজন করা গেলে ৪/৫ লক্ষ কোটি টাকার সম্পদে পরিণত করা যেত, তা নস্যাৎ করা হয়েছে। কারণ বিদেশিদের ভাগের সিংগভাগ গ্যাস তাদের কাছ থেকে আমাদের কিনতে হচ্ছে আন্তর্জাতিক বাজার দরে। ১০০০ ঘনফুট ১৮৬ টাকা দরে কিনে ৯২ টাকা দরে দেশের বাজারে বিক্রি করতে হচ্ছে। এরশাদ আমলে চট্টগ্রাম সার কারখানা কাফকোকে দেশিয় দামের চেয়ে কম দামে অর্থাৎ তৎকালীন ৩০ টাকা দরে গ্যাস সরবরাহের যে চুক্তি করেছিল তা এখন গলার কাঁটা হয়েছে। ভারতীয় টাটা কোম্পানিও ঐ একই দরে গ্যাস কিনে বাংলাদেশে ইস্পাত কারখানা ও বিদ্যুৎ উৎপাদন করার আলোচনা অনেকদূর এগিয়ে এনেছিল। আমেরিকান কোম্পানি অক্সিডেন্টাল মাগুড়ছড়ায় ৫ হাজার কোটি টাকার গ্যাসসহ প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকার সম্পদ বিনষ্ট করে কোন ক্ষতিপূরণ না দিয়েই আমেরিকান আরেক কোম্পানি ইউনোকলের কাছে মালিকানা দিয়ে চলে গেছে। কানাডার নাইকো কোম্পানি সম্প্রতি টেংরাটিলায় ৪ হাজার কোটি টাকার গ্যাস পুড়িয়েছে। ক্ষতিপূরণ বা জবাবদিহিতার নামগন্ধও নেই।

- জোট সরকারের জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী বলেছিল, গ্যাস ক্ষেত্রে সিস্টেম লস ২০০ কোটি টাকা যার মধ্যে চুরি হয় ১৮০ কোটি টাকা, তেলে সিস্টেম লস ৫০০ কোটি টাকা যার মধ্যে চুরি ৪০০ কোটি টাকা। বিদ্যুৎক্ষেত্রে সিস্টেম লস ৭৪০ কোটি টাকা, যার ৬০০ কোটি টাকা যায় বিদ্যুৎ খাতের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পকেটে। বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী বলেছিল যে, ২৫০০ কোটি টাকা ডেসার ইঞ্জিনিয়াররা আত্মসাৎ করেছে। সেই সাথে তিনি দাবি করেছেন যে ঢাকায় এ সকল ইঞ্জিনিয়ারদের ৪/৫টা করে বাড়ি রয়েছে। অথচ ঐ চুরির টাকা উদ্ধার না করে দফায় দফায় গ্যাস-বিদ্যুৎ-পানির দাম বাড়ানো হয় কার স্বার্থে? একদল চুরি করবে আর তার দায় বহন করবে সৎ নিরীহ সাধারণ মানুষ! এটা কোন নীতি?

- বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। একসময় এদেশে ১২০০ নদীর নাম পাওয়া যেত। এখন ২৯০টি নামে থাকলেও বাস্তবে চলমান নেই। শীতকালে ৬০/৬৫টির বেশি নদী প্রবাহমান থাকে না। এখন পানি উন্নয়ন বোর্ড বলছে, ২৫টি নদী সহসাই শুকিয়ে যাবে। ১৯৭১ সালে নদীগুলোর সম্মিলিত দৈর্ঘ ২৪,০০০ কিলোমিটার

Scanned with CamScanner

হিসাবে থাকলেও এখন তা ৮,৪০০ কিলোমিটারও নেই। ভারত থেকে ৫৪টি ও বার্মা থেকে ৩টি, মোট ৫৭টি নদী নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত। এ নদীগুলি বাংলাদেশসহ চীন, ভূটান, নেপাল ও ভারতের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার কারণে এগুলি আন্তর্জাতিক নদী। অথচ ভারত আন্তর্জাতিক নিয়ম-নীতি লংঘন করে উজানে নিজেদের অংশে অধিকাংশ নদীতে বাঁধ দিয়েছে। প্রধান ৩টি নদী পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা; এই ৩টি-ই ভারতের জল-আগ্রাসনের শিকার। ভারত পদ্মার উজানে ফারাক্কায় বাঁধ দিয়েছে। এখন মেঘনার উৎসনদী সুরমা-কুশিয়ারার উজানে বরাক নদীতে বাঁধ দেয়ার আয়োজন করছে। ব্রহ্মপুত্র দিয়ে এদেশের মোট পানিপ্রবাহের ৬১ ভাগ আসে। ভারত আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের মাধ্যমে সেই ব্রহ্মপুত্র নদ থেকে পানি সরিয়ে নেয়ার পরিকল্পনা করেছিল। এমনিতেই ফারাক্কার কারণে উত্তরবঙ্গের ১৬ জেলায় মরুকরণ এবং দক্ষিণাঞ্চলে লবণাক্ততা শুরু হয়েছে। ভূ-পৃষ্ঠের পানি কমে যাওয়ায় এবং বিশ্বব্যাংকের পরামর্শে ও তাদের চাপানো ঋণের টাকায় বাড়তি দামে ডিপ টিউবয়েল, শ্যালো টিউবয়েল দিয়ে ভূগর্ভস্থ পানি অধিকমাত্রায় তোলার কারণে প্রায় ৩ কোটি মানুষ আর্সেনিক বিষযুক্ত পানি পান করতে বাধ্য হচ্ছে। এরপর নতুন দুই প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে বাংলাদেশ হবে মরুভূমি, আক্রান্ত হবে লবণাক্ততায়। গোটা দেশের কৃষি, শিল্প, নৌ পরিবহন ব্যবস্থা, মৎসসম্পদ, জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ ধ্বংস হবে। আর্সেনিক বিষ ছড়িয়ে পড়বে সারাদেশে। শাসক দলগুলোর কেউ ভারতপ্রীতি আবার কেউ সস্তা ভারতবিরোধী শ্লোগান দিয়ে নিজেদের রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করলেও এ বিষয়ে কোন মনোযোগ নেই।

- স্বাধীনতার ৩৭ বছর পরও আমাদের কোন সুষ্ঠু পানিসম্পদ নীতিমালা নেই। বাংলাদেশের নদী-খাল, হাওড়-বাওড় যেগুলো দখল হয়ে গেছে সেগুলো উদ্ধার করা হচ্ছে না। মাঝে মাঝে শুধু লোকদেখানো হৈ-হুল্লোড় ছাড়া নদী-খাল খনন ও ভূপৃষ্ঠে পানি সংরক্ষণ এবং সংরক্ষিত পানির পরিমাণ বাড়ানোর বাস্তব কোন কর্মপরিকল্পনা নেই। একটি সামগ্রিক পরিকল্পনার অধীনে খরা-বন্যা-ভাঙন প্রতিরোধের অংশ হিসাবে কাজ না করে বরং নির্বাচনকে সামনে রেখে অপরিকল্পিতভাবে নদী ড্রেজিং, খাল খনন, বন্যানিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ, স্লুইস গেট নির্মাণ ইত্যাদি কাজে ব্যাপক দুর্নীতির একটি চিত্র ২৭ মার্চ '০৫ ডেইলি স্টার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ গুরুত্বপ্রাপ্ত এ সব প্রকল্প প্রধানমন্ত্রী, তার ভাই ও বোন, বাণিজ্যমন্ত্রী, আইনমন্ত্রী, টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী, শ্রমমন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী, জামাতের দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী, আওয়ামী লীগের মোহাম্মদ আলীসহ হাতে গোনা কয়েকজন মন্ত্রী-এমপিদের হাতে দেয়া হয়েছে। মন্ত্রী-এমপিদের এলাকা বিবেচনা করে কি নদীর প্রবাহ চলে? না তার ভাঙনের হিসাব কিংবা গতিবিধি নির্ধারিত হয়? তাহলে সার্বিক পরিকল্পনার বাইরে এ বরাদ্দের যৌক্তিকতা কী? আবার বর্ষাকাল আসলেই নদীভাঙন রোধের তোড়জোড় পড়ে

Scanned with CamScanner

যায়। চাঁদপুর-সিরাজগঞ্জসহ সারাদেশে এইভাবে টাকা আত্মসাতের উৎসব চলে।

- দেশে ১৮ লক্ষ ৫৫ হাজার পুকুর-পুষ্করিণী-দীঘিকে সংস্কার করে মৎস্য চাষের উপযোগী করলে এবং তার সাথে ছোট একটি ডেইরি-পোল্ট্রি স্থাপন, শাক-সব্জী চাষ, ফলজ ও বনজ গাছ রোপনসহ পরিকল্পিত গৃহায়নের ব্যবস্থা করা গেলে ১টি পুকুরকেন্দ্রিক প্রকল্পে ৮টি পরিবারের অন্তত ২০ জনের কর্মসংস্থান ধরলেও ৩ কোটি ৬০ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান করা যায়। নদী-খাল-বিল-হাওড়ে পরিকল্পিত মাছ চাষ ও অন্যান্য প্রকল্পের আওতায় জেলেসহ আরও ১ কোটি মানুষের জীবিকানির্বাহ হতে পারে। আমূল ভূমিসংস্কার করে কৃষিভিত্তিক শিল্পায়নের উদ্যোগ নিলে ২ কোটি মানুষের কর্মসংস্থান এবং খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ করা যায়। নদী-নালা, খাল-বিল, হাওড়-বাওড় ও সাগরের মাছে ৩০ কোটি মানুষের প্রয়োজন মেটানো সম্ভব। বিপুল মৎসসম্পদ প্রক্রিয়াজাত করে রফতানিও সম্ভব। মৎস্য রফতানিকারকদের হিসাব হল, মাত্র ৮০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করলে এখাত থেকে সরকার বছরে ১০ হাজার কোটি টাকা আয় করতে পারে। কোকাকোলা, ফান্টা ইত্যাদি না খেয়ে আম, আনারস, লেবু, কলা, কাঁঠাল, জাম্বুরা, পেঁপে, পেয়ারা ইত্যাদির জুস-জেলী ও হরেক রকম খাবার তৈরি করা যায়। আমরা বাজার এতটাই মুক্ত করেছি যে ভারতের পেঁয়াজ-মরিচ-ডাল-চিনি তো আছেই, আমসত্ত্ব, পাকিস্তানি আমের জুস, ভুটানের আমের আঁচার, মালয়েশিয়ার পরোটা পর্যন্ত বাজার ছেয়ে ফেলেছে। এর কোন জবাব আছে?

- বিশ্বের সেরা শক্তি জনশক্তি। সেরা সম্পদ জনসম্পদ; যদি তাকে শিক্ষা-সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে গড়ে তোলা যায়। দেশের জনশক্তিকে দক্ষ করে গড়ে তোলা ছাড়া অর্থাৎ সকল জনগণকে শিক্ষিত করা ছাড়া জাতীয় উন্নতি বা শোষণ-বঞ্চণামুক্ত গণতান্ত্রিক সমাজ কোনটাই সম্ভব নয়। সরকার নিজেই স্বীকার করছে যে দেশের ৮৯ হাজার ৯২৮টি গ্রামের মধ্যে কমপক্ষে ৫২ হাজার ২৫১টি গ্রামে কোন সরকারি প্রাথমিক স্কুল নেই। ১ কোটি ১০ লাখ শিশু প্রাইমারি পাশ করার আগেই শিক্ষা থেকে বিদায় নেয়। দেশের শিক্ষাকে এরা কোথায় এনে দাঁড় করিয়েছে তা বোঝা যায় বিভিন্ন সময়ে পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে। এতে বলা হয়েছে, স্বাধীনতার পর থেকে প্রাথমিক শিক্ষা ও নিরক্ষরতা নিয়ে অনেক বাগাড়ম্বর হলেও এ পর্যন্ত গৃহিত সরকারের সব প্রকল্প-পরিকল্পনাই ব্যর্থ হয়েছে। ২০১৫ সালের মধ্যেও সরকার সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে পারবে না। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে বিগত এক দশকে প্রায় ২ হাজার প্রাথমিক স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে এবং ছাত্র-ছাত্রী কমে গেছে সাড়ে ৫ লাখ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সাথে সঙ্গতি রেখে বর্তমানে প্রাথমিক স্কুলগামী শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমপক্ষে ২ কোটি ২৫ লাখ হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল, কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কাগজে-কলমে ১ কোটি ৫৫ লাখ ৩ হাজার ৯০৯ জন। এ সব ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকেই স্কুলে যায় না, এবং প্রাথমিক স্তরে ড্রপ আউট প্রায় ৫০%। গ্রাম-গঞ্জের বহু স্কুলে শিক্ষক নেই, ক্লাসরুম নেই, টুল-টেবিল বেঞ্চ নেই।

Scanned with CamScanner

- সরকার শিক্ষার আর্থিক দায়িত্ব ক্রমাগত এড়াতে চাইছে, উৎসাহিত করছে বেসরকারি স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন। অথচ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে ২২ মার্চ '০৫ দৈনিক ইনকিলাবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. এম আসাদুজ্জামানকে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, "দেশের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে সার্টিফিকেট বিক্রির দোকানে পরিণত হয়েছে। সবকিছুই চলছে ভাড়ায়। কিন্তু ছাত্রদের কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা নিয়ে কোর্স শেষ হবার নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই ভালো রেজাল্টের সার্টিফিকেট দেয়া হচ্ছে।" তিনি আরও বলেন, একটি নামকরা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনে গিয়ে এক ছাত্রকে জিজ্ঞেস করেছিলাম বলো তো বাবা – "আমার শরীর যেন কেমন কেমন করে" ইংরেজি কি? স্মার্ট ছেলেটির উত্তর "মাই বডি নোজ হাউ হাউ ফিলিংস।" ইংরেজি শিক্ষা যেখানে প্রধান বিষয় সেখানে এই হচ্ছে এদের মান!
- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজগুলোতে বছরের বেশিরভাগ সময়ই ক্লাস হয় না পরীক্ষাসহ নানা বন্ধ থাকার কারণে। কলেজগুলোতে সবচেয়ে প্রকট হচ্ছে শিক্ষকস্বল্পতা, পাশাপাশি ক্লাসরুম, ল্যাবরেটরি-লাইব্রেরি, হোস্টেল, পরিবহনসহ শিক্ষার সামগ্রিক আয়োজনের বিশাল ঘাটতি। কিন্তু সরকারের যে সে দিকে দৃষ্টি নেই, তা এখন আরও বেশি পরিস্কার। এখন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় নাম দিয়ে ছাত্রপ্রতি লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করে ফলাফল সম্পূর্ণ নেতিবাচক হওয়ার পর সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোকে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে শিক্ষাকে ধনিকশ্রেণীর পণ্যে এবং গরিবের নাগালের বাইরে নিয়ে যাবার চক্রান্ত চলছে। জগন্নাথ কলেজ ও ব্রজমোহন কলেজ নিয়ে সরকারের সাম্প্রতিক ঘোষণা তারই নজির।
- রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে শিক্ষা-চিকিৎসাসহ জাতীয় উন্নয়ন ও জনকল্যাণকর বিষয়ের প্রশ্ন আসলেই বলা হবে, টাকা বা পুঁজি নেই। এটা একটা অত্যন্ত প্রতারণামূলক বুলি। দেশের সম্পদ লুটপাটের যে সামান্য চিত্র আমরা হাজর করেছি, অন্তত এ থেকেও যে কেউ এ সত্য বুঝতে পারবেন। এর বাইরেও পত্রিকায় প্রকাশিত হয় না এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে যায় এমন বহু অপচয় ও লুটতরাজের ঘটনা আছে। তারপরও পুঁজির সংকট? এই যুক্তি দেখিয়েই আমাদের শাসকরা ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ছুটে বেড়ায় এবং বিদেশি সাম্রাজ্যবাদীদের কথিত বিনিয়োগ নিয়ে তাদের উৎসাহের অন্ত থাকে না। কারণ বিনা উৎপাদনে এবং বিনা শ্রমে মুষ্টিমেয় লোকের আমিরী করার এবং ভাগ্য গড়ার এটাই পথ!
- ভারতের টাটা কোম্পানি ২ বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ১২ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করে ইস্পাত কারখানা, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সার কারখানা করার কথা বলায় হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু দেশের একমাত্র ইস্পাত কারখানা চট্টগ্রাম স্টীলমিল কেন বন্ধ করা হয়েছে? কেন কাফকো-কে পানির দামে গ্যাস দিয়ে সর্বনাশ করা হয়েছে?

Scanned with CamScanner

কেন আদমজী বন্ধ, কেন পাট-সূতা-বস্ত্র-চিনি কলগুলো বন্ধ, কেন মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি বন্ধ ইত্যাদি নিয়ে কোন আলোচনা নেই। তারপরও একথা কেউ-ই বলছে না যে প্রবাসী বাংলাদেশিরা বছরে প্রায় ৬ বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ প্রায় ৪২ হাজার কোটি টাকা দেশে পাঠায়। তাদের পাঠানো টাকার পুরোটা পরিবারের লাগে না। এই ৪২ হাজার কোটি টাকার ১০ হাজার কিংবা ১৫ হাজার কোটি টাকা তাদের পরিবারগুলোকে দিয়ে বাকি টাকায় শিল্প করে তাদের মাঝে শেয়ারবন্ড সার্টিফিকেট দিলে দেশের উন্নতি হয়, আবার প্রবাসীদেরও একদিন দেশে ফিরে সুখী ও নিরাপদ জীবনের সন্ধান মেলে। কিন্তু তা হবার নয়। ১৮০ কোটি টাকা বিনিয়োগের কথা শুনলেই পররাষ্ট্রমন্ত্রী, বাণিজ্যমন্ত্রী ও আমলারা বিমানবন্দরে লাল গালিচা বিছিয়ে কথিত বিনিয়োগকারী ও দাতাদের কদমবুছি করতে ব্যস্ত হয়। অথচ ৪২ হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার যোগানদাতারা দেশে আসলে ব্যাগ কাটা এমনকি গলা কাটা যাওয়ারও নজির আছে। আদম ব্যাপারীদের নির্দয় জালিয়াতির শিকার হয়ে সাগরে-মরুতে প্রাণ হারিয়ে কারাবাস করে কত কষ্ট করে রক্ত জল করা টাকা প্রবাসীরা দেশে পাঠায়। অথচ মন্ত্রী-আমলা, তথাকাথিত ব্যবসায়ী-শিল্পপতিরা বেশুমার লুটপাট করে দেশের টাকা বিদেশে পাচার করে। প্রবাসীদের বিনিয়োগে এরা উৎসাহী নয়, কারণ তাতে কমিশন খাওয়া কঠিন।

- গত ৩৭ বছর যারা দেশ শাসন করেছে তারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আকাঙ্ক্ষাকে পদদলিত করে দেশ শাসন করেছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছিল শোষণমুক্ত, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক আত্মনির্ভর সার্বভৌম জাতি গঠনের। অথচ শোষণমুক্তির বদলে দেশি-বিদেশি লুটেরাদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত করা হয়েছে দেশকে। ১০ লক্ষ লোকের কাছে ১৩ কোটি ৯০ লক্ষ লোক জিম্মি হয়ে আছে। গণতন্ত্রের নামাবলি গায়ে দিয়ে নির্বাচিত-অনির্বাচিত, সামরিক-অসামরিক স্বৈরশাসন চালানো হয়েছে। বহুদলীয় সংসদীয় ব্যবস্থার নামে বাস্তবে একদলীয় পার্লামেন্টই চলেছে। জনগণের কাছে জবাবদিহিতা বলে কিছু নেই। গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার বদলে আমলাতন্ত্র, বিচারব্যবস্থা, নির্বাচন কমিশন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সর্বত্র দলীয়করণ করে রেখেছে। জমি বরাদ্দ, হাট-ঘাট ইজারা, টেন্ডার থেকে শুরু করে বিচারপতি-ভাইস চ্যান্সেলর-নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ পর্যন্ত সর্বত্র দলীয়করণের নগ্ন ছায়া বিস্তৃত হয়ে আছে। সামরিক বাহিনীর আয়-ব্যয়ের হিসাবও জনগণের সামনে প্রকাশ করা হয় না। জাতীয় স্বার্থবিরোধী অসংখ্য চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে যার বিন্দুমাত্র দেশবাসী জানে না।

- ধর্মনিরপেক্ষতার বদলে, সংবিধানের ১২ নং অনুচ্ছেদ, যেখানে লেখা ছিল, "ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাস্তবায়নের জন্য : (ক) সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতা; (খ) রাষ্ট্র কর্তৃক কোন ধর্মকে মর্যাদা দান; (গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার; (ঘ) কোন বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তার উপর নিপীড়ন - বিলোপ করা হবে।" ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে তাকে উড়িয়ে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ ১২ নং অনুচ্ছেদ বলে সংবিধানে কিছু নেই। এর মাধ্যমে

Scanned with CamScanner

প্রকারান্তরে সাম্প্রদায়িকতাকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। যার ফলে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার কাজে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার, সাম্প্রদায়িক সহিংসতা, মসজিদ-মাদ্রাসা করার নামে মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশ থেকে অর্থ এনে জালিয়াতি, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ড টানিয়ে খাসজমি দখলসহ ধর্মীয় ভণ্ডামি-ফতোয়াবাজি চরম রূপ নিয়েছে।

- ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারে এরা পাকিস্তানিদের হার মানিয়েছে। 'ধানের শীষে বিসমিল্লাহ্', 'নৌকার মালিক তুই আল্লাহ্', 'লাঙল মার্কার কাম রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম', 'ভোট দিলে পাল্লায় খুশি হবে আল্লায়' ইত্যাদি ধর্মীয় ভাঁওতাবাজির শেষ নেই। প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে খালেদা জিয়া তার মাসের বেতন মাদ্রাসায় দেয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন, কিন্তু নিজের দুই ছেলের একটাকেও মাদ্রাসায় পড়াননি। প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে শেখ হাসিনা মাদ্রাসার জন্য আগের সরকারের চেয়ে ১০০ কোটি টাকা বেশি বরাদ্দের ঘোষণা দিয়েছিলেন। কিন্তু নিজের ছেলেকে মাদ্রাসায় দূরে থাক দেশেও পড়াননি। এরশাদ, গোলাম আজম, নিজামী, মাওলানা মান্নান থেকে শুরু করে অসংখ্য মাদ্রাসাপ্রেমীর সন্তানরা মাদ্রাসায় পড়ে না। বরং আমেরিকার চোখ পড়েছে মাদ্রাসার উপর।

- জাতীয়তাবাদ, যার মূল কথা হল আত্মনির্ভরশীল জাতি গঠন, তার বদলে বিদেশি খবরদারি ও ঋণ-খয়রাতির উপর দেশকে দাঁড় করানো হয়েছে। শাসকশ্রেণী সাম্রাজ্যবাদের কাছে নতজানু হয়ে আছে। এরা জাতীয় সমস্যায় বিদেশিদের নাক গলাবার সুযোগই শুধু করে দিয়েছে, তাই নয়, নিজেদের ক্ষমতাকেন্দ্রিক পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদের নালিশ-আবদার পর্যন্ত ওদের কাছে ন্যস্ত করে। আবার সাম্রাজ্যবাদী এক গোষ্ঠীকে খুশি করার জন্য অন্যদের উদ্দেশে ফাঁকা গরম বুলি ছেড়ে নিজেদের নতজানু চেহারা আড়াল করার চেষ্টা করে। দেশকে এতটাই পরনির্ভর করা হয়েছে এবং মার্কিন রাষ্ট্রদূতসহ বিদেশি কর্মকর্তা ও লগ্নীসংস্থার প্রতিনিধিদের সীমা লংঘন করার এতটাই সুযোগ করে দেয়া হয়েছে যে এদের অতিরিক্ত চাপের মুখে আমাদের শাসকদের নাকি সুরের বিলাপও মাঝে-মধ্যে শোনা যায়।

- শাসক বুর্জোয়াশ্রেণী রাজনীতি থেকে নীতি-আদর্শ-দেশপ্রেম ও সকল প্রকার মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়েছে এবং নষ্ট করে চলেছে। ২৬ মার্চ '০৫ পত্রিকার খবরে প্রকাশ, ১৯৭২ সাল থেকে ২০০০ সালের ৫ নভেম্বর পর্যন্ত অস্ত্রের লাইসেন্স দেয়া হয়েছিল ১ লাখ ৮৯ হাজার ৫৬৫টি। এর মধ্যে ১ লাখ ৩৫ হাজার অস্ত্রের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি। বিগত জোট সরকার ক্ষমতায় বসেই বিভিন্ন অপরাধে দায়েরকৃত ৭০ হাজার মামলা তুলে নিয়েছিল। কয়েক দিন আগেও একজন সাংসদের বিরুদ্ধে টেন্ডার ছিনতাইসহ দুটি মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছে। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের গত নির্বাচনে ৩২ জন দাগী সন্ত্রাসীকে জোট সরকার মনোনয়ন দিয়েছিল। এরাই আবার সন্ত্রাস দমনের কথা বলে। মুজিব সরকারের আমলে রক্ষী

Scanned with CamScanner

বাহিনী একসময় বিনা বিচারে গুম-খুন চালিয়েছিল। সামরিক আমলে সন্ত্রাসীদের লেলিয়ে দিয়ে ও পুলিশ দিয়ে রাজপথে আন্দোলনকারীদের হত্যা করা হয়েছে। ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে বহু নিরাপরাধ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। জোট সরকার সামরিক বাহিনী নামিয়ে হার্ট এটাক নাম দিয়ে মানুষ খুন করার পর র‍্যাব-চিতা-কোবরা দিয়ে ক্রসফায়ারী হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে। ১৯৯৬-২০০১ সালে সরকারের আমলে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের কথিত নেতা শততম ধর্ষণ উদ্‌যাপন করেছিল। আর জোট সরকারের আমলে এদের সংগঠন ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বুয়েটের কথিত নেতাদের টেন্ডার দখলের সশস্ত্র ক্রসফায়ারে সনি নামের এক ছাত্রী দিনে-দুপুরে খুন হয়েছে। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের কথিত নেতা ধর্ষণ করেছিল সহপাঠীকে। এরা এইভাবেই ছাত্র-যুবক, শ্রমিক, ব্যবসায়ী, আমলা-কর্মচারীসহ সর্বমহলের চরিত্রনাশ করছে।

- ধনিকশ্রেণীর দলসমূহের রাজনৈতিক বাণিজ্য ও দুর্বৃত্তায়ন কোন পর্যায়ে গেছে তা বোঝা যায় যখন টিআইবি প্রধান অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ অভিযোগ তোলেন যে, বিগত ৮ম সংসদের ১০৪ জন সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে! তিনি আরও বলেছিলেন যে, ২০০১ সালের নির্বাচনে সংসদ সদস্য পদে নির্বাচনকারী প্রধান প্রধান দলের প্রার্থীদের ১ থেকে ২৭ কোটি টাকা পর্যন্ত খরচ করতে হয়েছে। ২৭ কোটি টাকা যারা খরচ করেছেন তারা প্রার্থী হওয়ার জন্য দলের তহবিলে দিয়েছেন ১০ কোটি টাকা, বাকি ১৭ কোটি টাকা সরাসরি নির্বাচনের কাজে খরচ করেছেন। আবার এরাই সংসদে গিয়ে জনস্বার্থে একটি কথা তো বলেই না, উল্টো কোরামের অভাবে কেবল ২০০৪ সালের ৪টি অধিবেশনে মিনিটে ১৫ হাজার টাকা করে ৫ কোটি ১ লাখ ১৫ হাজার টাকার অপচয় করেছে। অর্থনৈতিক লুটতরাজ, রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন, সাংস্কৃতিক অবক্ষয় ও স্বৈরাচারী-স্বেচ্ছাচারী শাসন-প্রশাসনের মধ্য দিয়ে এরা একদিকে সন্ত্রাসী তৈরি করছে অন্যদিকে সন্ত্রাসের বিভিষীকায় আক্রান্ত জনগণের চোখে ধূলা দেয়ার জন্য কথিত সন্ত্রাস দমনের নামে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালাচ্ছে। এইভাবে শেষ পর্যন্ত জনগণের অধিকার ও আন্দোলনের উপরই খড়্গ ঝোলানো হচ্ছে।

- সংবিধানকে বলা হয় দেশের সর্বোচ্চ আইন। অনেক কাটাছেঁড়া করে মূল অঙ্গীকার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এবং অসংখ্য কালো আইন তৈরি করে তাকে একটা গোঁজামিলের দলিলে পরিণত করা হয়েছে। তবে এই সংবিধানও এরা মানে না।

  বাংলাদেশের সংবিধানের প্রথম অঙ্গীকার ছিল যে জনগণের মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার পরিপন্থী যত আইন বৃটিশ ভারতে এবং পাকিস্তান আমলে জারি ছিল সব বাতিল হবে এবং স্বাধীন বাংলাদেশে এ ধরনের কোনে কালো আইন প্রণয়ন করা যাবে না। কিন্তু সংবিধানের ২য় সংশোধনীর মাধ্যমে তাকে নাকচ করে দেয়া

Scanned with CamScanner

হয়েছে। এইভাবে সংবিধানের গণতান্ত্রিক অঙ্গীকার গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে। তারপর ৪র্থ সংশোধনীতে একদলীয় শাসন, ৫ম সংশোধনীতে মোশতাক-জিয়ার অবৈধ সামরিক শাসনকে বৈধ করার পাশাপাশি সংবিধানের মাথায় বিসমিল্লাহ বসিয়ে ধর্মীয় প্রতারণা করা হয়েছে। জেনারেল এরশাদের নেতৃত্বে অবৈধ সামরিক শাসনকে বৈধতা দেয়ার জন্য ৭ম সংশোধনী এবং ৮ম সংশোধনীতে ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম করে চরম ধর্মীয় প্রতারণা যেমন করা হয়েছে তেমনি ধর্মীয় বিভাজন রেখা টেনে সংখ্যালঘু ধর্মীয় জনগোষ্ঠীকে বাস্তবে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করা হয়েছে।

সাম্প্রদায়িক বিভাজন, হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষদের এদেশ থেকে বিতাড়ন, সম্পত্তি দখল ও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির ঘোলা জলে পূর্ব বাংলাকে শাসন করার উদ্দেশ্যে পাকিস্তানি শাসকদের প্রণীত শত্রুসম্পত্তি আইন স্বাধীনতার পর থেকে এখনও পর্যন্ত অর্পিত সম্পত্তি আইন নামে পুনর্বহাল আছে। আর এ সবকিছুর সুযোগ নিয়ে গত ৩৭ বছরে হিন্দু সম্প্রদায়ের ৫০ লাখ মানুষের কমপক্ষে ২০ লাখ একর ভূ-সম্পত্তি জবরদখল হয়েছে। অথচ সংবিধানের ২৮ নং অনুচ্ছেদে সুস্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে যে, ধর্মবিশ্বাসের কারণে মানুষে মানুষে পার্থক্য করা চলবে না। আর সংবিধানের ৪২ নং অনুচ্ছেদে সম্পত্তির অধিকারের সুরক্ষা দেয়া আছে। এ দুটোকেই লংঘন করা হয়েছে।

সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদের 'ক' ধারায় বলা আছে, রাষ্ট্র আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সর্বজনীন বৈষম্যহীন একমুখী শিক্ষাব্যবস্থা চালু করবে। অথচ তারা তিন ধারায় শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা করে আসছে। শুধু তাই নয়, শিক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্র পালন করার অঙ্গীকার পালনের পরিবর্তে ক্রমাগত বেতন-ফি বৃদ্ধি আর বাণিজ্যিকীকরণের মাধ্যমে শিক্ষাকে জনগণের নাগালের বাইরে নিয়ে গেছে।

সংবিধানের ২০ নং অনুচ্ছেদে বলা আছে, অনুপার্জিত আয় ভোগ করা যাবে না। অথচ স্বাধীনতার পর থেকেই অনুপার্জিত আয় তথা কালো টাকাকে সাদা টাকা করার বিধান প্রতি বাজেটেই করা হচ্ছে। তথাকথিত ইসলামদরদী ও ধানের শীষে বিসমিল্লাহ উৎপাদনকারীরা একদিকে সংবিধান লংঘন করছেন, বিভিন্ন সময়ে বাজেটে হারামের টাকাকে হালাল করার বিধান করেছে। ৭ জুন '০২ দৈনিক ইত্তেফাকের রিপোর্ট অনুযায়ী প্রস্তাবিত বাজেটে যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের যে কোন অংকের কালো টাকাকে বিনা প্রশ্নে সাদা করার সুযোগ দিয়েছিল। ১ জুলাই থেকে ৩০ জুন ২০০৫ পর্যন্ত কোন পণ্য বা সেবা উৎপাদনে নিয়োজিত ব্যবসা, শিল্প ও বাণিজ্যিক উদ্যোগে যে কোন অংকের অর্থ বিনিয়োগকে বিনা প্রশ্নে এবং শর্তহীনভাবে গ্রহণের বিধান করা হয়েছিল।

১৫ নং অনুচ্ছেদে পরিকল্পিত অর্থনীতির মাধ্যমে জনগণের আর্থিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি বিধান, জীবনের মৌলিক চাহিদা খাদ্য, পোশাক, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা এবং কাজের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং যুক্তিসঙ্গত মজুরি প্রতিষ্ঠার কথা বলা

Scanned with CamScanner

আছে। অথচ এরা চালু করেছে মুক্তবাজার অর্থনীতি। কাজের অধিকার দেয়া দূরে থাক, শিল্প-কারখানা-ব্যাংক-বীমা বন্ধ করে বা বিরাষ্ট্রীয়করণ করে চলছে শ্রমিক ছাঁটাই।

সংবিধানের ১৮ নং অনুচ্ছেদে বলা আছে, রাষ্ট্র পতিতালয় ও জুয়া বন্ধের কার্যকর পদক্ষেপ নেবে। অথচ বাংলাদেশে পতিতাবৃত্তিকে আইনসঙ্গত করে রাখা হয়েছে। দুঃস্থ অসহায় এসব নারী ও শিশুদের মর্যাদাপূর্ণ পুনর্বাসনের লক্ষ্যে কিছু করা হয় নি।

২২ নং অনুচ্ছেদে বলা আছে, রাষ্ট্র প্রশাসন থেকে বিচারব্যবস্থাকে পৃথক রাখার নিশ্চয়তা বিধান করবে। আমাদের শাসকেরা ৩৭ বছরে বিচার বিভাগকে স্বাধীন করার ফুরসত পায় নি। প্রশাসন থেকে বিচার বিভাগ পৃথক করার জন্য ১৯৯৯ সালে সুপ্রীম কোর্ট সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনাসহ নির্দেশ জারি করেছিল। সে সময় প্রধান বিচারপতি বলেছিলেন, সরকারের সদিচ্ছা থাকলে ১ দিনের মধ্যেই এর বাস্তবায়ন শুরু করা সম্ভব। তারপর বহু বছর কেটে গেলেও কোন সরকারেরই সময়-সাধ্যে কুলোয় নি! তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিচার বিভাগকে পৃথক করলেও সম্পূর্ণ স্বাধীন করা হয়নি।

সংবিধানের ২৫ নং অনুচ্ছেদে বলা আছে, রাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ বা বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন দেবে। অথচ ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ইরাক আগ্রাসন ও দখল করার পরও সরকারি প্রতিবাদ বা পার্লামেন্টে কোন নিন্দা প্রস্তাব পর্যন্ত উত্থাপিত হয়নি।

সবিধানের ৩৫ অনুচ্ছেদের 'ক' ধারায় বলা আছে, প্রত্যেক ব্যক্তির অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড প্রকাশ্য আদালতে দ্রুত বিচারের অধিকার থাকবে। অথচ র‍্যাব-চিতা-কোবরা ইত্যাদি বাহিনীর নামে চলছে 'ক্রসফায়ার' খুন। পুলিশও এই 'ক্রসফায়ারী' খুনে পিছিয়ে নেই। এ ধরনের অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। অথচ এরাই নিজেদের ক্ষমতায় থাকা কিংবা ক্ষমতায় যাওয়ার স্বার্থে যখন তখন সংবিধানের দোহাই পাড়ে, সংবিধান মানা না-মানা নিয়ে বিতর্ক করে, কিংবা সংবিধান রক্ষার মায়া-কান্না কাঁদে। এ সবের কোন মানে দাঁড়ায় কি?

- লুটেরা অর্থনীতি সন্ত্রাসের ভিত্তিভূমি। এর থেকেই প্রধানত জন্ম নেয় অপরাপর সন্ত্রাস। ছড়িয়ে পড়ে উপরিকাঠামোতে তথা রাজনীতি, সংস্কৃতি, ধর্মসহ সর্বক্ষেত্রে। অভাব-অনটন যখন চরম রূপ নেয়, দু'মুঠো ভাত জোগাড় করার জন্যও যখন কাজ থাকে না তখন চুরি, ডাকাতি, ছিনতাইসহ অসামাজিক ও অপরাধমূলক কাজ হবে ও বাড়তে থাকবে। তাহলে কি অপরাধের শাস্তি বিধানের বা শাসনের কোন প্রয়োজন নেই? অবশ্যই আছে। কিন্তু কোনটা আগে গুরুত্ব দেয়া দরকার? আগে শিক্ষা, কাজসহ মৌলিক অধিকারের বাস্তবায়ন; পরে শাস্তি-শাসন। এ কাজ করবে কে? রাজনৈতিক শক্তি, যারা শাসন পরিচালনা করবে। কিন্ত যারা এখনও পর্যন্ত শাসকশ্রেণীর দল হয়ে আছে, তাদের চরিত্র কী? তারা কীভাবে দল গঠন করে, দল

Scanned with CamScanner

পরিচালনা করে, কোন নীতি-আদর্শের চর্চা করে, করলে তা প্রগতিশীল কি-না ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করলে দেখা যাবে আজকের দিনে বুর্জোয়া দলগুলি নীতি-আদর্শের ধার ধারে না। যুক্তিবাদের বদলে সুবিধাবাদের চর্চা করে। রাজনীতি নিয়ে বাণিজ্য করে। কর্মীদের আদর্শবাদী করার বদলে ভাড়াখাটা কর্মীতে পরিণত করে। কোটি টাকায় নমিনেশন বিক্রি করে। বেকার ও অর্থলিপ্সু অধঃপতিতদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে সন্ত্রাসী হিসেবে কাজে লাগায়, আবার কাজ সেরে গেলে বা তাদের চেহারা প্রকাশ হয়ে পড়লে মুখ রক্ষার তাগিদে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও নেয়। সাম্রাজ্যবাদের কাছে নতজানু থাকে। দেশকে দেউলিয়া বানিয়ে নিজের পকেট ভরার কাজে তাদের সহায়তা নেয়। আবার মাঝে মাঝে বখরা নিয়ে লুটের ভাগ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদ যখন বেশি চেপে বসে, তখন গরম গরম হুংকারও ছাড়ে। এগুলো রাজনৈতিক দেউলিয়াত্ব ও দুর্বৃত্তায়ন। এতে সন্ত্রাস রাজনৈতিক চেহারা নিতে থাকে।

- সাম্রাজ্যবাদী শক্তিও বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এই রাজনৈতিক সন্ত্রাসের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ মদদ দিয়ে থাকে। আবার ধর্মীয় মূল্যবোধবর্জিত উগ্র ধর্মান্ধতা ও ইহজাগতিক স্বার্থ-সুবিধার মেলবন্ধনে মৌলবাদী জঙ্গীত্ব সন্ত্রাসের চেহারা নেয়। প্রগতিশীল রাজনৈতিক চিন্তার মধ্যেও বিজ্ঞানমনস্কতার ঘাটতি, অন্ধ অনুকরণ, ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে না পারার কারণে পুনঃপৌনিক ব্যর্থতা থেকে উদ্ভূত হতাশা ও গণবিচ্ছিন্নতা থেকেও সন্ত্রাস দেখা দিতে পারে। এর আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক উৎসমূলে না গিয়ে উপর থেকে ডালপালা ছাঁটাই করার মত করে সন্ত্রাস নির্মূল করা যায় না। বরং গণতন্ত্রের নামে স্বৈরতান্ত্রিক শাসকশ্রেণী এ পরিস্থিতি কাজে লাগিয়ে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস শুরু করে। অনেকটা ফ্যাসিবাদী কায়দায় ক্ষমতা মজবুত করার চেষ্টা করে।

  তাছাড়া এই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস যাদের দিয়ে করানো হচ্ছে তাদের অবস্থাই বা কী? ২৪ মার্চ, ২০০৫ পত্রিকায় শিরোনাম হয়েছে "ডাকাতি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়েছে ৩ র‍্যাব সদস্য, পালিয়েছে ৬ জন।" এর পরপরই সংবাদপত্রে এসেছে গঠনের ৩৬৫ দিন পার হওয়ার আগেই র‍্যাবের ২২২ সদস্যের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এ সব অভিযোগের মধ্যে ডাকাতি, চাঁদাবাজি, ভয়-ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ আদায় ও অর্থ আত্মসাৎই প্রধান। শোনা যাচ্ছে, এবার র‍্যাবের দুর্নীতি ধরতে গোয়েন্দা লাগানো হবে। কিন্তু র‍্যাব-চিতা-কোবরার যারা চালক সেই দুর্নীতিবাজ, লুটেরা গডফাদারদের চরিত্রের ছাপ যে ওইসব বাহিনীর ওপরও পড়বে, তা খুবই স্বাভাবিক।

- তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থাও এরা বিতর্কিত করে ফেলেছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত বহু ধরনের শাসনপদ্ধতি এদেশে চলেছে। স্বাধীনতার পর প্রথম সংসদীয় শাসন, তারপর একদলীয় শাসন, রাষ্ট্রপতির শাসন, সামরিক শাসন, সামরিক শাসনের গায়ে গণতন্ত্রের লেবাসী শাসন, তারপর আবার সামরিক

Scanned with CamScanner

শাসন, কথিত নখদন্তহীন সামরিক শাসনের ছত্রছায়ায় রাষ্ট্রপতি চালিত সংসদও চলেছে। '৯০-এর গণঅভ্যুত্থানে সামরিক শাসন উচ্ছেদের পর নির্বাচনে সংসদীয় পদ্ধতির পুনঃপ্রবর্তন ঘটলেও গত তিন সংসদের একটিও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু হতে পারে নি। গত ৩৭ বছর শাসনক্ষমতার কোন্দলে খুন হয়েছে দুইজন রাষ্ট্রপতি। এর বাইরেও অসংখ্য রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তরে ক্যু-পাল্টা ক্যু হয়েছে বহুবার। এ সব ঘটনা প্রমাণ করে বুর্জোয়া দলগুলো জনগণকে তো বটেই, নিজেদের কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯৯০ সালে গণঅভ্যুত্থানের পরিস্থিতিতে সামরিক স্বৈরশাসক এরশাদের উৎখাতের পর সৃষ্ট শূন্যতা পূরণের জন্য। পরবর্তী সময়ে শাসক দলগুলোর প্রতি জনগণের অনাস্থা, বুর্জোয়া দলগুলোর নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস এবং আপেক্ষিক অর্থে নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিপ্রেক্ষিত ও প্রত্যাশায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু দুর্নীতিবাজ শাসকশ্রেণী তাকেও দুর্নীতিগ্রস্ত করে ফেলেছে। নিজেদের লোককে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান বানানোর জন্য বিচারপতির মেয়াদ বাড়ানো কিংবা নিয়োগ দেয়ার ঘটনাও ঘটেছে। আবার ক্ষমতা ছাড়ার পূর্বমুহূর্তে গোটা প্রশাসনের ব্যাপক রদবদল করে নিজেদের পছন্দমাফিক সবকিছু সাজিয়ে জাল-জালিয়াতির চালও চেলেছে। ফলে বিদ্যমান দুর্নীতিগ্রস্ত শাসন কাঠামো বহাল রেখে নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয়, এটা সবাই উপলব্ধি করছেন। নির্বাচনকে নিরপেক্ষ করার প্রাথমিক শর্ত হল নির্বাচনে সন্ত্রাসী গডফাদার, কালোটাকা, ঋণখেলাপী ও ধর্মব্যবসায়ীদের দৌরাত্মের অবসান। সেদিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারসহ শাসকশ্রেণী কারো মনোযোগ নাই। জনগণের জীবনের দাবি এবং প্রকৃত গণ-আন্দোলনের সম্ভাবনাও তাদের ফাঁপা বিতর্কে চাপা পড়ছে। বুর্জোয়া দ্বি-দলীয় ধারায় জনগণকে একবার চুলায় পোড়ানো আরেকবার তপ্ত কড়াইতে ভাজার খেলাকেই আবার ঘুরিয়ে আনা হচ্ছে। সেজন্যই জনজীবনের সংকট ও জাতীয় স্বার্থের দাবিতে আন্দোলনের পাশাপাশি এ চক্রান্তও রুখতে হবে।

- ধর্মবিশ্বাসী এবং ধর্মব্যবসায়ীদের মধ্যে পার্থক্যরেখা '৭১ সালে তৈরি হয়েছিল যার কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলমান হয়েও রাজাকার, আলবদর হয়নি বরং ধর্মের ঐ ধ্বজাধারীদের বিরুদ্ধেই দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু বুর্জোয়া তথাকথিত জাতীয়তাবাদী শক্তির বদৌলতে ধর্মব্যবসায়ীরা আবার খানিকটা জায়গা করে নিয়েছে। এদের ধর্মীয় প্রতারণাও পরিষ্কার। ক্ষমতার ভাগ পেলে এদের ফতোয়া পাল্টে যায়, 'হারাম নারী নেতৃত্ব'ও জায়েজ হয়ে যায়! আদমজী বন্ধ হলে লাভ হয় ভারতের, আর শোকরিয়া জানায় জামায়াতে ইসলামী। কালোটাকা অর্থাৎ হারামের টাকাকে যখন বাজেটে 'সাদা' তথা 'হালাল' করা হয়, তখন এদের ইসলাম নষ্ট হয় না। বিশ্বব্যাংককে দায়মুক্তি দেয়ার আয়োজনে এদের অসুবিধা নেই। একদিকে এরা ভারতবিরোধী শ্লোগান দেয়, অন্যদিকে টাটাকে আমন্ত্রণ জানায়। সাম্রাজ্যবাদীদের

Scanned with CamScanner

কাছ থেকে শর্ত এবং সুদযুক্ত ঋণ গ্রহণ, ইরাকে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন-দখল ও গণহত্যার পরও সংসদে নিন্দা প্রস্তাব না এনে নীরব থাকা, এ-সবই এদের আসল চরিত্র। পাশাপাশি জনমত ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য কাদিয়ানী মসজিদ দখল, যাত্রা-গান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে বোমাবাজি, নানা জাতের ফতোয়াবাজিসহ কথিত ইসলামী হুকুমতের নামে মৌলবাদী সন্ত্রাসে মদদ দিয়ে এরা দেন-দরবারের শক্তি বৃদ্ধি ও ক্ষমতার ভাগ মজবুত রাখে। এরা আজ আর শুধু '৭১-এর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দালাল নয়, সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদেরও বিশ্বস্ত সেবাদাসে পরিণত হয়েছে। এ কথা না বুঝলে এদের প্রকৃত স্বরূপ বোঝা যাবে না। সেজন্য তথাকথিত জাতীয়তাবাদী, যারা '৭১ সালে এদেরকে বন্দুকের নলের সামনে রেখে মোকাবেলা করেছে, তাদের এখন এদের সাথে গোপন সমঝোতা করতে কিংবা মন্ত্রীসভায় বসে দেশ চালাতে অসুবিধা হয় না। আর মার্কিনীরাও তাদের 'মডারেট' সার্টিফিকেট দিতে অস্বস্তি বোধ করে না।

- শ্রমিক-কর্মচারীদের দুর্দশা এবং জীবনযাপনের অনিশ্চয়তার কোন সীমা নেই। পাকিস্তান আমলে '৭১-এর জল্লাদ ইয়াহিয়া খানও ১৯৬৯ সালে শ্রমিক-কর্মচারীদের ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করেছিল। তৎকালীন বাজার মূল্যে তাতে একজন শ্রমিক ৫ মণ চালের সমান মজুরি পেত। আর স্বাধীনতার ৩৭ বছর গত হওয়ার পর তথাকথিত দেশদরদী, শ্রমিকদরদী জাতীয়তাবাদী কোন সরকারই শ্রমিকদের জাতীয় ন্যূনতম মজুরি আইন করে ঘোষণা করে নি। পাকিস্তানি শোষক আদমজী-ইস্পাহানীরা কারখানা করার সময় শ্রমিক কলোনী, স্কুল, চিকিৎসাকেন্দ্র ইত্যাদি স্থাপন করত। আর স্বাধীন দেশের লুটেরাগোষ্ঠী কলোনী-স্কুল-হাসপাতাল স্থাপন দূরে থাক, অনেকক্ষেত্রে নিয়োগপত্র পর্যন্ত দেয় না। ১২/১৪ ঘণ্টা খাটায়, মাসের পর মাস বেতন আটকে রাখে। গার্মেন্টস্ কারখানায় আগুনে পুড়ে এ পর্যন্ত প্রায় ৪ শতাধিক শ্রমিক মৃত্যুবরণ করেছে। জাহাজ ভাঙার কাজে প্রায়ই বিষাক্ত বর্জ্যে ও দুর্ঘটনায় শ্রমিকদের প্রাণহানি ঘটে চলেছে। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত আইএলও (ILO) মোতাবেক শ্রমঅধিকার বেশির ভাগই লংঘিত হচ্ছে। কথায় কথায় কারখানা লে-অফ, লক-আউট করে দেয়া হচ্ছে। বিগত জোট সরকারের অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন যে ২০০ বড় ব্যবসায়ী ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান আয়কর দেয় না। এরা দেড় কোটি টাকা দামের গাড়ি, ৫ কোটি টাকা দামের বাড়ি করতে পারে কিন্তু শ্রমিকের বেতন, আয়কর, বিদ্যুৎ-গ্যাস-টেলিফোন ইত্যাদি বিল দিতে পারে না। চুরি-দুর্নীতি করে সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানা ধ্বংস করা হয়েছে। অন্যদিকে মুক্তবাজারি ব্যক্তিখাতের নামে দেশি-বিদেশি লুটপাটকে চরমে পৌঁছানো হয়েছে। আর শ্রমিক-কর্মচারীরা যার-পর-নাই দুঃখ-কষ্ট ও অমানবিক পরিবেশে চাকুরি এবং জীবনের নিরাপত্তাহীনতায় দিন গুজরান করছে।

- সভ্যতা বলতে নারীসভ্যতা কিংবা পুরুষসভ্যতা বোঝায় না। সভ্যতা মানেই মানবসভ্যতা। নাগরিক বললেও পুরুষ এবং নারী উভয়কেই বোঝায়। কিন্তু বাস্তবে সমাজ, রাষ্ট্র, পরিবার, কর্মস্থল সর্বত্র নারীকে পশ্চাৎপদ অবস্থায় ফেলে রাখা

Scanned with CamScanner

হয়েছে। সিনেমা-সঙ্গীত-বিজ্ঞাপনে নারীদের অবস্থা বেদনাদায়ক ও অসম্মানজনক। সেজন্য সমাজের উন্নতি অগ্রগতি হচ্ছে ব্যাহত, সভ্যতা হচ্ছে বিকৃত। ভোগবাদী সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা নারীদেরও ভোগ্যপণ্যের কাতারে শামিল করে দিয়েছে। সামন্তীয় কূপমণ্ডূক চিন্তায় নারীকে যেমন গৃহপণ্যে পরিণত করা হয়েছিল, একইভাবে পুঁজিবাদে তাকে পরিণত করা হয়েছে বাজারী পণ্যে। আইন, প্রথা-প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক নানা দিক দিয়ে নারীরা বৈষম্য ও অবমাননার শিকার হয়ে আছে। পুরুষশাসিত এই সমাজে পতন হলে নারী হয় পতিতা, আর একই পতনে পুরুষ থাকে অনেকটা মুক্ত বিহঙ্গ। মুক্তিযুদ্ধে নারীরা শুধু ধর্ষিত-ই হয় নি, প্রতিরোধ সংগ্রামে ও আত্মত্যাগে তারা পুরুষদের চেয়ে কোন অংশে পিছিয়ে ছিল না। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে তাদের বিশাল অবদান ও ভূমিকা ইতিহাস-আলোচনায় গুরুত্ব পায় নি।

- ১৯৭১ সালে পাক-হানাদার বাহিনী এবং তাদের দোসরদের হাতে ২ লক্ষ মা-বোন নির্যাতিত হয়েছিল। কিন্তু স্বাধীনতাত্তোর এ পর্যন্ত ১০ লক্ষাধিক নারী-শিশু নানা নির্যাতনের শিকার হয়েছে। প্রতি বছর ২০ হাজার নারী বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে। খুন, ধর্ষণ, যৌতুকের কারনে খুন, এসিড নিক্ষেপ, ফতোয়াবাজীসহ নানা ভাবে দেশের নারীরা নির্যাতিত হচ্ছে। শুধুমাত্র ২০০৭ সালেই নির্যাতনের শিকার হয়েছে ১৩৪১ জন নারী। নারী নির্যাতন কতটা ভয়াবহ মাত্রায় পৌঁছেছে, তা এই পরিসংখ্যান থেকেই বোঝা যায়। স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশে নারীর এই হাল কোন ক্রমেই সহনীয় নয়। স্বামীর অনুপস্থিতিতে কিংবা পিতার শূন্যস্থান পূরণ করতে গিয়ে, কিংবা পুরুষ নেতাদের কেউ কাউকে নেতা না-মানার অমিমাংসিত কোন্দলের সমাধানে একজন নারীকে শিখণ্ডী দাঁড় করিয়ে দিলেই নারীদের অবস্থার মৌলিক পরিবর্তন হয় না, যদি না পুরুষশাসিত এবং ভোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে একটি সর্বাত্মক সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও নারীমুক্তির লক্ষ্যে একটা শক্তিশালী রাজনৈতিক আন্দোলন দাঁড় করানো যায়। এ কথাটা বোঝা দরকার।

- আজ থেকে ১৫০ বছর আগে মনীষী কার্ল মার্কস বলেছিলেন, পুঁজিবাদ তার জন্মের পর মানবসমাজ ও সভ্যতাকে অনেক কিছু দিয়েছে। কিন্তু এখন তার ক্ষয়ের কাল। অর্থাৎ এখন পুঁজিবাদ টিকে থাকলে মানবসভ্যতার যা কিছু অর্জন, তা একে একে ধক্ষংস করতে থাকবে। ৯০ বছর আগে রুশ বিপ্লবের নেতা লেনিন সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে বলেছিলেন, পুঁজিবাদ বিকশিত হয়ে সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র অর্জন করেছে। এই সাম্রাজ্যবাদ টিকে থাকলে যুদ্ধ থাকবে। দুটো বিষয়ই আজ দিবালোকের মত পরিষ্কার। পুঁজিবাদ কিভাবে মানুষের জীবন থেকে মনুষ্যত্ব কেড়ে নিয়েছে, কিভাবে সভ্যতার মহৎ অর্জনগুলো একে একে ধ্বংস করছে তা বাংলাদেশসহ যে কোন পুঁজিবাদী দেশের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। এই সাম্রাজ্যবাদ আজ কতটা হিংস্র ও আগ্রাসী হয়ে উঠেছে, তার জ্বলন্ত সাক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আফগানিস্তান, ইরাক ও প্যালেস্টাইন। আমেরিকা থেকে বাংলাদেশ, সর্বত্রই পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের এক ও অভিন্ন অবক্ষয়ী চেহারা।

Scanned with CamScanner

- সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো তাদের অর্থনৈতিক সংকট কাটানোর জন্য আমাদের ঘাড়ে চেপে বসেছে। মার্কিনীরা অস্ত্র বিক্রি করার জন্য যুদ্ধকে আবশ্যম্ভাবী করেছে। এনরন, জেনারেল মটরসসহ দেশের বৃহত্তর শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর মন্দা ও পতন ঠেকাতে দুনিয়ার তেল সম্পদ লুট করতে দখল করেছে আফগানিস্তান ও ইরাক। বাংলাদেশের তেল-গ্যাস, বিদ্যুৎ-বন্দর, ব্যাংক-বীমা, শিল্প-কৃষি-সেবাখাত সবই নিয়ন্ত্রণে নেবার জন্য মুক্তবাজারী-প্রাইভেটাইজেশন প্রায় সমাপ্ত করে এনেছে। টিফা চুক্তি (Trade and Investment Framework Agreement), বিশ্ব ব্যাংকের দায়মুক্তি ইত্যাদি করার জন্য চাপ দিচ্ছে। আবার হানা (Humanitarian Assistance Needs Assesment) চুক্তি করে মার্কিনীদের যে কোন সময় বাংলাদেশে অবাধ উপস্থিতি, মার্কিন সেনাদের অপরাধ দায়মুক্তি, এমওআই (Memorandum of Intent - MOI) ইত্যাদি করিয়ে নিয়েছে।

  অন্যদিকে ভারত ফারক্কা বাঁধের পর এখন ব্রহ্মপুত্র, মেঘনার উপর জল-আগ্রাসনের থাবা বিস্তার করেছে। পাশাপাশি টাটার বিনিয়োগের নামে গ্যাস লুণ্ঠন, সীমান্ত, ছিটমহলসহ অন্যান্য অসংখ্য বিরোধ জিইয়ে রেখে বাংলাদেশের বাজারের উপর কর্তৃত্ব এবং রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ স্থায়ী করতে চাইছে। বাংলাদেশের মত ভারতের গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন এবং প্রগতিশীল জনগণও ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদী ও আগ্রাসী নীতির বিরোধী। কিন্তু উভয় দেশের শাসকগোষ্ঠী কৌশলে সাম্প্রদায়িকতাকে উস্‌কে দিয়ে প্রকৃত গণসংগ্রামের শক্তিকে দুর্বল করতে চায়।

- আজ আমেরিকার সিয়াটল থেকে ইতালির জেনোয়া পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ জনতা বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা, বিশ্বব্যাংক ইত্যাদির মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে কানাডা থেকে অস্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা থেকে কোরিয়া পর্যন্ত সর্বত্র সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও দখলবিরোধী বিক্ষোভে শরিক হচ্ছে মানুষ। তালেবানী আফগানিস্তান যা পারেনি, আপেক্ষিক সেক্যুলার ইরাক মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হৃৎপিণ্ডে আঘাত হেনে বিশ্বব্যাপী যে ঝড় তুলেছে, তা চোখ খুলে দেয়ার মত ঘটনা। আর বামপন্থি শক্তিই যে আজ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী প্রকৃত লড়াই গড়ে তুলতে পারে এবং পুঁজিবাদের অভিশাপমুক্ত সমাজ গঠনের সংগ্রাম এগিয়ে নিতে পারে, তাও পরিষ্কার। বহু সংগ্রামী ঐতিহ্যের বাংলাদেশে সেই জাগরণ ঘটছে। বাসদ তাকে এগিয়ে নেয়ার লড়াইয়ে নিয়োজিত। সেই সংগ্রামের অংশ হিসাবেই আমরা নির্বাচনে অংশ নিয়ে আমাদের ৭ দফা শোষণবিরোধী লড়াইয়ের সনদ হাজির করছি। বাসদের এই সংগ্রামে শরিক হোন।

১. সব হাতে কাজ ও সব মুখে ভাতের নিশ্চয়তা বিধান

ক. চুরি-দুর্নীতির প্রতিকার, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও আধুনিকায়ন করে সকল বন্ধ কারখানা চালুর পাশাপাশি নতুন শিল্প নির্মাণ; পাট, চিনি ও গার্মেন্টস শিল্প রক্ষা; ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ কারখানা নির্মাণ; কৃষিভিত্তিক শিল্প গড়ে তোলা।

Scanned with CamScanner

খ. বেকারদের কাজ দেয়া, নইলে বেকার-ভাতা প্রদান। সরকারি সকল শুন্যপদে নিয়োগ দান। পুনর্বাসন ছাড়া রিক্সা-হকার-বস্তি উচ্ছেদ বন্ধ। শহরে খাস জমিতে স্বল্পমূল্যে ঘর নির্মাণ এবং বস্তিবাসীসহ নিম্ন আয়ের মানুষদের কাছে কিস্তিতে হস্তান্তর করা, ভাড়া দেওয়া।

গ. সরকারি খাস জমি প্রকৃত ভূমিহীনদের মাঝে বরাদ্দ দেয়া। আমূল ভূমি সংস্কার। বে-দখল সকল জমি-সম্পত্তি উদ্ধার। ঢাকাসহ সব বড় শহরে জমির সিলিং ঘোষণা। বাড়ি ভাড়া-গাড়ি ভাড়া সুনির্দিষ্ট করা।

ঘ. নদী-খাল খনন করা। ১২০০ নদ-নদী উদ্ধার ও সচল করা। ভূগর্ভস্থ পানির বদলে ভূপৃষ্ঠের পানি সংরক্ষণ ও সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে সেচব্যবস্থা ও ৩ কোটি মানুষকে আর্সেনিকের হাত থেকে রক্ষা করা। পানি ও মৎস্য সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার ও উৎপাদন নিশ্চিত করা। বন্যা, নদী-ভাঙ্গন, জলাবদ্ধতা ও মঙ্গা প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ। উন্মুক্ত জলাভূমিতে প্রকৃত জেলেসহ সকলের মাছ ধরার অধিকার নিশ্চিত করা।

ঙ. ভিজিএফ, ভিজিডি কার্ড, টেস্ট রিলিফ, কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) ও উন্নয়ন প্রকল্পের কাজে দুর্নীতি ও চুরি বন্ধ করা। ভূমিহীনদের রেজিস্ট্রেশন কার্ড ও সারাবছরের কাজ নিশ্চিত করা। এনজিওদের শোষণ-নির্যাতন বন্ধ করা। মহাজনী ঋণের সুদীব্যবসা নিষিদ্ধ করা। চাল, ডাল, আটা ও তেল সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু ও ন্যায্য মূল্যের দোকান খোলা। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম জনগণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখার জন্য ভ্যাট ও পরোক্ষ কর কমানো।

চ. সারা দেশে গ্রাম–শহরে রেশনিং ও গণবন্টন ব্যবস্থা চালু করা। গ্রাম-শহর সর্বত্র দারিদ্র্যসীমার নিচের সকল মানুষের জন্য সামরিক বাহিনীর রেটে পূর্ণ রেশনিং চালু করা। বয়স্ক ও দুঃস্থ ভাতা কমপক্ষে ১০০০ টাকা করা। অনাথ-এতিম শিশু, পঙ্গু ও প্রতিবন্ধিদের রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব নেয়া।

ছ. জাতীয় বাজেটে কৃষিখাতে উন্নয়ন বাজেটের ৪০% বরাদ্দ দেয়া; কৃষি ফসলের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা। সব বড় হাট-বাজারে সরকারি ক্রয়কেন্দ্র চালু করা যাতে ফসল ওঠার সাথে সাথে খোদ কৃষকের কাছ থেকে ন্যায্য দামে ফসল ক্রয় ও সংগ্রহ করা যায়। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)-কে কার্যকর ও দুর্নীতিমুক্ত করে তৃণমূল পর্যায়ে বিস্তৃত করা। কৃষিতে ভর্তুকি প্রদান। সার, বীজ, কীটনাশকসহ কৃষি উপকরণ ন্যায্যমূল্যে সময়মত সরবরাহ করা। নামমাত্র সুদে ফসলী ঋণ ও শস্যবীমা চালু করা।

২. *সন্ত্রাস, দুর্নীতি, সাম্প্রদায়িকতা, লুটপাট, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন ও দলীয়করণ বন্ধ করা*

ক. নীতি-আদর্শহীন, সন্ত্রাস-কালোটাকা নির্ভর রাজনীতি বর্জনে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা। টাকার বিনিময়ে নির্বাচনে মনোনয়ন বিক্রি বন্ধ করা। ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার

Scanned with CamScanner

নিষিদ্ধ করা। যুদ্ধাপরাধীদের বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বিচার করা। কোন অজুহাতেই মুক্তচিন্তা, যুক্তি ও বিবেকের উপর জবরদস্তি না করা। মসজিদ-মাদ্রাসা-মন্দির-গীর্জা, সরকারি দলের অফিস/ক্লাব, আশ্রম ইত্যাদি নামে সরকারি জমি দখল, ব্যবসা ও রাজনৈতিক কাজে ব্যবহার বন্ধ করা।

খ. হার্ট এ্যাটাক-ক্রস ফায়ার নাম দিয়ে বিচার বহির্ভূত রাষ্ট্রীয় খুন-খারাবী বন্ধ করা। বিচার বহির্ভূত যে সব হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে সেগুলোর তদন্ত ও বিচার করা। সন্ত্রাসী গড ফাদারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সন্ত্রাসের উৎস আর্থিক শোষণ, সামাজিক বৈষম্য, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, সাম্প্রদায়িকতা ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয় রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

গ. সকল রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডসহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সিনেমাসহ বিভিন্ন স্থানে, সভা-সমাবেশে বোমা-গ্রেনেড হামলার সুষ্ঠু তদন্ত, সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার ও বিচার করা।

ঘ. শুধু নামকাওয়াস্তে নয় বিচার বিভাগকে আইন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা এবং বিচার বিভাগের জবাবদিহিতা সহ বিচারক নিয়োগ নীতিমালা প্রশাসনের প্রভাবমুক্ত ও গণতান্ত্রিক করা। বিচার বিভাগের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করা। সামরিক-বেসামরিক প্রশাসন, বিচার বিভাগ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, দুর্নীতি দমন কমিশন, নির্বাচন কমিশনসহ সর্বত্র শুধু ব্যক্তির পরিবর্তন নয়, স্বচ্ছ জবাবদিহিতাসহ কার্যপরিধি ও কার্যবিধি গণতান্ত্রিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠা করে দলীয়করণ বন্ধ করা। কালো টাকার মালিক ও ঋণখেলাপিদের নির্বাচনে প্রার্থীতার অযোগ্য ঘোষণা করা। তত্ত্বাবধায়ক সরকার, সামরিক-বেসামরিক-আমলাতন্ত্র, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানকে বগলদাবায় রেখে নির্বাচনে জেতার চক্রান্ত বন্ধ করা।

ঙ. সংবিধানের ২য়, ৪র্থ, ৫ম, ৭ম ও ৮ম সংশোধনী এবং বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৫০৫ (ক), ৫০৬ (ক), ১২১ (ক), ১২৪ (ক) ধারা, বাংলাদেশ দণ্ডবিধি ৯৯ (ক) ধারা, ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ধারা, ডিএমপি ৮৬ ধারা, বিশেষ ক্ষমতা আইন '৭৪ বৈষম্যমূলক উত্তরাধিকার আইনসহ সকল অগণতান্ত্রিক কালা-কানুন বাতিল কর। অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি আইন বাতিল করা। সংবিধানের ১২ নং অনুচ্ছেদ পুনর্বহাল করা, ধর্ম ব্যবসায়ীদের কবল থেকে ধর্মবিশ্বাসী মানুষদের রক্ষা করা। 'ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার' এই নীতিতে শাসনকার্য ও রাষ্ট্র পরিচালনা করা।

চ. সভা-সমাবেশ, মাইক ও সভাস্থল ব্যবহারে অনুমতি গ্রহণের নামে রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ কৌশল বাতিল করা। সভা-সমাবেশ-মিছিল-হরতাল-অবরোধসহ সব ধরনের গণতান্ত্রিক কর্মসূচির ওপর হামলা-বাধা-নিষেধাজ্ঞা-হয়রানি বন্ধ করা। জরুরি অবস্থার বিধান বাতিল, গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ বাতিল করা।

ছ. কারও বিরুদ্ধে মিথ্যা-হয়রানিমূলক মামলা দায়ের প্রমাণিত হলে মামলা দায়েরকারী পুলিশ কর্মকর্তার উপর ঐ মামলার সর্বোচ্চ শাস্তি প্রয়োগ করার আইন করা।

Scanned with CamScanner

৩. অনুপার্জিত আয় বাজেয়াপ্ত করা। দেশি-বিদেশি লুটপাট বন্ধ করা

ক. ঘুষ-সন্ত্রাস-দখল-খেলাপি-জালিয়াতিসহ অবৈধ উপায়ে অর্জিত নামে-বেনামে স্থাবর-অস্থাবর আয়ের সাথে সঙ্গতিহীন সকল সম্পত্তি জব্দ করে জাতীয় উন্নয়ন ও পুনর্বাসন কর্মসূচিতে কাজে লাগানো। কালো টাকা সাদা করার বিধান বাতিল। কালোটাকার মালিকদের শাস্তির ব্যবস্থা করা। স্বাধীনতাত্তোর প্রতিটি সরকারের মন্ত্রী, এমপি, সামরিক-বেসামরিক আমলা ও কর্মকর্তাদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পদের হিসাব নেয়া।

খ. মুক্তবাজারের নামে বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতি ধ্বংসের নীতি বাতিল করা। তেল-গ্যাসের উৎপাদন বন্টন চুক্তি (পিএসসি)সহ জাতীয় স্বার্থবিরোধী সকল অসম চুক্তি বাতিল করা। তেল-গ্যাস-বিদ্যুৎ-বন্দর-রেলওয়েসহ সকল জাতীয় সম্পদ সাম্রাজ্যবাদী বহুজাতিক কোম্পানীর গ্রাস থেকে রক্ষা করা। মাগুড়ছড়া ও টেংরাটিলায় ছাতক গ্যাসক্ষেত্র ধ্বংস ও সম্পদ নষ্টের ক্ষতিপূরণ আদায় করা। কথিত সিস্টেম লস ও চুরি এবং দফায় দফায় বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাসের দাম বৃদ্ধি বন্ধ করা। লোডশেডিং দূর করা। সারাদেশের ৮০% বিদ্যুৎ সুবিধাবঞ্চিত মানুষকে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা। উত্তরবঙ্গ-দক্ষিণবঙ্গসহ সারাদেশে ৯৪% গ্যাস সুবিধাবঞ্চিত মানুষকে গ্যাস সরবরাহ করা।

গ. প্রতি বছর সৃষ্ট ৫০ হাজার কোটি কালোটাকা উদ্ধার ও বিদেশে টাকা পাচার রোধ করা। ৩০ হাজার কোটি টাকার খেলাপি ঋণ উদ্ধার করা। রিশিডিউলের নামে ঋণ মওকুফ ও রেয়াত দিয়ে খেলাপি ঋণ কম দেখানো ও ঋণখেলাপিদের উৎসাহিত করার অপতৎপরতা বন্ধ করা।

ঘ. বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ-এর দায়মুক্তি দেয়ার চক্রান্ত বন্ধ করা। বিত্তবানদের লুটপাট ও আমিরী রক্ষার জন্য জাতীয় স্বার্থবিরোধী শর্তযুক্ত বিদেশি ঋণ-খয়রাতি গ্রহণ বন্ধ করা; দেশের অর্থনীতিকে স্বনির্ভর করার যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা। বন্ড বা শেয়ার মালিকানার ভিত্তিতে প্রবাসীদের পাঠানো টাকা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বিনিয়োগের ব্যবস্থা নেওয়া। বিদেশী বিনিয়োগের নামে সাম্রাজ্যবাদী বহুজাতিক কোম্পানির লুটপাট বন্ধ করা। বিলাসদ্রব্য আমদানি বন্ধ, চোরাচালানি রোধ করে ও রফতানি বাড়িয়ে বাণিজ্যঘাটতি কমানো।

৪. রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সবার জন্য বৈষম্যহীন মানসম্মত শিক্ষা ও চিকিৎসা নিশ্চিত করা শিক্ষা-চিকিৎসার বাণিজ্যিকীকরণ এবং শিক্ষার সাম্প্রদায়িকীকরণ বন্ধ করা

ক. সংবিধানের ১৭ নং অনুচ্ছেদ ও '৯০-এর সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের ১০ দফার ভিত্তিতে সর্বজনীন, বৈষম্যহীন, বিজ্ঞানভিত্তিক, সেক্যুলার ও একমুখী (one channel of education) গণতান্ত্রিক শিক্ষানীতি চালু করা। শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা ও সর্বোচ্চ বেতন কাঠামো চালু, উচ্চতর প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা।

খ. সবার জন্য শিক্ষা উন্মুক্ত করা, শিক্ষার আর্থিক দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে রাষ্ট্রের খাতে ন্যস্ত করা। প্রতি দুইশ' পরিবারের জন্য একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু ও

Scanned with CamScanner

ড্রপ-আউট বন্ধ করা। স্নাতক পর্যন্ত সবার জন্য বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা চালু করা, প্রত্যেক জেলায় কমপক্ষে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা। শিক্ষা গবেষণায় বরাদ্দ বৃদ্ধি করা। টাকা দিয়ে বিদ্যা কেনার বিদ্যাবিপণী বন্ধ করা। ব্র্যাকের হাতে প্রাইমারি স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব দেয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল করা।

গ. সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে আধুনিক চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত ও পর্যাপ্ত করা, ঔষধ সরবরাহ নিশ্চিত করা। চিকিৎসা ব্যবসা ও দুর্নীতি বন্ধ করা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশ অনুযায়ী প্রতি ৫০০ জনে ১ জন ডাক্তার নিয়োগ করা। প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এবং কারখানায় হেলথ্ সেন্টার চালু করা ও ডাক্তার নিয়োগ দেয়া। স্বাস্থ্যনীতি-২০০৮ বাতিল করা। এনজিও'র হাতে হাসপাতাল ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল করা।

ঘ. সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষাপ্রশাসনের স্বায়ত্তশাসন ও গণতান্ত্রিক পরিচালনবিধি নিশ্চিত করা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হল হোস্টেলে দখলদারিত্বের অবসান ঘটিয়ে গণতান্ত্রিক পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করা।

৫. শ্রমিক-কর্মচারীদের মনুষ্যোচিত 'ন্যূনতম মজুরি' আইন করে ঘোষণা করা শিল্প-কৃষি ধ্বংসের চক্রান্ত বন্ধ করা

ক. গার্মেন্টস্, পরিবহনসহ সকল সরকারি-বেসরকারি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-কর্মচারীদের নিয়োগপত্র, আইন প্রণয়নসহ জাতীয় ন্যূনতম মজুরি, আইএলও সনদ মোতাবেক ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারসহ সকল সুবিধাদি নিশ্চিত করা। গার্মেন্টস, শিপ- ব্রেকিংসহ সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠানে কাজের নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা। ইপিজেড-এর নামে জাতীয় স্বার্থ ও শ্রমিক স্বার্থবিরোধী আইন-বিধি বাতিল করা। শিশুশ্রম বন্ধ করা। শিল্পাঞ্চলে শ্রমিককলোনী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য ও শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র খোলা। অগণতান্ত্রিক শ্রম আইন ২০০৬ বাতিল, শ্রম অধ্যাদেশ ২০০৮ বাতিল করে গণতান্ত্রিক শ্রম আইন প্রবর্তন করা।

খ. শিল্প-কৃষিতে ডব্লিওটিও, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ-সহ সকল বিদেশি হস্তক্ষেপ বন্ধ করা। টার্মিনেটর বীজসহ জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ ধক্ষংসকারী কীটনাশক ও প্রযুক্তির অনুপ্রবেশ রোধ করা। কৃষি গবেষণায় গুরুত্ব দেওয়া। নদী-জলাশয় দখল, বন-উদ্যান উজাড় করা, পাহাড় কাটা, রাসায়নিক বর্জ্য ফেলাসহ বায়ু-পানি-শব্দ দূষণকারী সকল কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা।

গ. টিএন্ডটি এবং ব্যাংক-বীমাসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠানের বিরাষ্ট্রীয়করণ বন্ধ করা। অতীতে বিরাষ্ট্রীয়করণকৃত কারখানাসমূহ বন্ধ হওয়া-সহ সকল দুর্নীতিমূলক কর্মকা-র তদন্ত ও বিচার করা। শিল্প-প্রতিষ্ঠান লে-অফ, লক-আউট করতে হলে শিল্প ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ও আদালতের রায় গ্রহণ করার বিধান করা। তদন্তসাপেক্ষে ব্যর্থ মালিকদের মালিকানা রাষ্ট্রের কাছে ন্যস্ত করা। শ্রমিক-কর্মচারীদের পুনর্বাসন ছাড়া কারখানা-প্রতিষ্ঠান বন্ধ না করা।

Scanned with CamScanner

ঘ. শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ)-এর সাথে সম্পাদিত সকল চুক্তি বাস্তবায়ন করা। শিক্ষক-প্রকৌশলী-আইনজীবী-চিকিৎসক-নার্স-পুলিশ-আনসার, কৃষিবিদ-সাংবাদিক-সংস্কৃতিকর্মীসহ সকল শ্রেণী-পেশার ন্যায্য দাবি মেনে নেয়া।

৬. অশ্লীলতা-অপসংস্কৃতি প্রতিরোধ করা। নারীর প্রতি সকল বৈষম্য বিলোপ ও সব ধরনের নির্যাতন অবসান এবং আদিবাসী ও দলিত সম্প্রদায়ের অধিকার বাস্তবায়নে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা

ক. 'ইউনিফরম সিভিল কোড' ও স্বয়ংসম্পূর্ণ পারিবারিক আদালত চালু করা। সংরক্ষণ প্রত্যাহারসহ সিডো সনদ বাস্তবায়ন করা। কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমমজুরি, উত্তরাধিকার আইনসহ সর্বক্ষেত্রে নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করা।

খ. ফতোয়াবাজ, নারী ও শিশু পাচারকারী এবং নারীদের পতিতাবৃত্তিতে নিয়োগকারী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান করা।

গ. পাহাড় ও সমতলের আদিবাসী ও দলিতদের ভূমি, ভাষা, শিক্ষা, জীবিকা, সংস্কৃতিসহ সকল গণতান্ত্রিক অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেয়া, ন্যায়সঙ্গত দাবিসমূহ বাস্তবায়ন করা।

ঘ. অশ্লীল সিনেমা নির্মাণ এবং অবৈধভাবে 'কাটপিস' সংযোজন, নীল ছবি প্রদর্শনের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আইন করা। সেন্সর বোর্ড পুনর্গঠন করা। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকেই সঙ্গীত-নাটক-নৃত্য-চিত্রাঙ্কনসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও খেলাধূলার আয়োজন করা। সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশ নিশ্চিত করা।

ঙ. জাতীয় প্রচারমাধ্যমকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা। বিজ্ঞাপনে নারীদেহের স্থূল প্রদর্শন বন্ধ, টেলিভিশনে এবং স্যাটেলাইট চ্যানেলে অরুচিকর ও অশ্লীল ছবি প্রদর্শন বন্ধ করা। নাটক-সিনেমা-সাহিত্যে, ওয়াজ-নসিহতে নারীদের সম্পর্কে অসম্মানজনক ও অশ্লীল উপস্থাপনা বন্ধ করা।

চ. সর্বনাশা মাদকের ব্যবসা বন্ধ করা, নেশার করালগ্রাস থেকে যুবসমাজকে রক্ষা করা। যুব সমাজকে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করা। যাত্রা, নাটক, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা।

ছ. জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন বৃদ্ধি করে ৬৪ করা এবং সরাসরি নির্বাচন দেওয়া। অফিস-আদালত, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসহ সকল কর্মস্থলে নারীর মর্যাদা নিশ্চিত করা। উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে নারী প্রতিনিধিদের যথাযোগ্য মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

৭. সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী নীতি ও লুটপাটের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করা

ক. ইরাক, আফগানিস্তান, ফিলিস্তিনসহ দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও গণহত্যা বন্ধ করা, দখলদারিত্বের অবসান এর দাবিতে সোচ্চার হওয়া।

Scanned with CamScanner

খ. কিউবা, উত্তর কোরিয়া, জিম্বাবুয়েসহ বিভিন্ন দেশের ওপর আরোপিত সাম্রাজ্যবাদী অবরোধ প্রত্যাহারে জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সকল ফোরামে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা।

গ. মার্কিন যুদ্ধ তৎপরতার অংশ হিসাবে বাংলাদেশকে ব্যবহারের ষড়যন্ত্র বন্ধ করা। মার্কিন সৈন্যদের দায়মুক্তি, পিসকোর, হানা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিনিময় চুক্তি, MOI বাতিল করা। টিফা, সোফা চুক্তির চক্রান্ত রুখে দাঁড়ানো।

ঘ. মার্কিন রাষ্ট্রদূতসহ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতদের রাজনৈতিক আচরণ ও দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ বন্ধ করা।

ঙ. গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যা আদায় করা। ভারতের আন্তঃনদীসংযোগ প্রকল্পের নামে ব্রহ্মপুত্রের পানি অপসারণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। মেঘনার উৎস সিলেটের সুরমা-কুশিয়ারার উজানে টিপাইমুখে বাঁধ দেয়ার ভারতীয় উদ্যোগ ঠেকানো। ভারতের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র সম্পর্কে জনগণকে সচেতন কর; সাম্প্রদায়িক উসকানি বন্ধ করা।

উপরোক্ত ৭ দফা বাস্তবায়ন ও শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পার্লামেন্টের ভিতরে-বাইরে লড়াইকে জোরদার করার জন্যে আসন্ন নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ মনোনীত প্রার্থীদেরকে **'মই'** মার্কায় ভোট দেয়ার জন্য দেশবাসীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ।

খালেকুজ্জামান

আহ্বায়ক

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ

Scanned with CamScanner